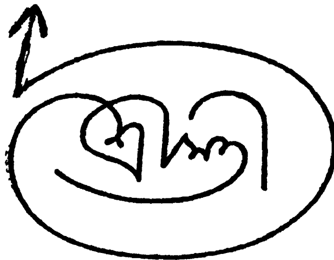


লীলা মজুমদার



সিগনেট প্রেস ।। কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৫৩

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এন্ড কোম্পানি

৭।১ গ্রান্ট লেন

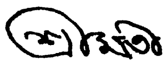
বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম দু টাকা চারআনা







সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো মানুষের মারা যেতে যতটা সময় নেওয়া উচিত, সকলেরই মনে হচ্ছিল, রমেশকাকা তার চেয়ে অনেকখানি বেশি নিয়ে ফেলছেন। মনে-মনে সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল। সুদীর্ঘ জীবনের নানান অবিবেচনার মতো এও যে শেষ একটি পরম অবিবেচনার কাজ সেবিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এলামাসি বেলামাসিদের নতুন হলদে চামড়ার সুটকেশে গরম কাপড়-চোপড়গুলো ইতিমধ্যেই গোছানো শেষ, দার্জিলিঙের হোটেলে আগামী পনেরো তারিখ থেকে ঘর বুক করাও হয়ে গেছে। এখন রমেশকাকা কি করেন কে জানে। অথচ অত বড় একটা ধনী লোক; বিদ্যায়, সম্মানে, নামডাকে কোনো অংশে কম না; তাঁর ভাইঝি হয়ে জন্মগ্রহণ করাও যে একটা সৌভাগ্য ও সুবিধা, একথাও অগ্রাহ্য করার নয়। লকেট্, বকেট্, অতুল, পুতুল, সকলেই নিশ্বাস রোধ করে প্রতীক্ষা করে আছে—কখন যবনিকা পড়বে। গানের ক্লাস, নাচের ক্লাস, কলেজের পড়া বোধ হচ্ছিল সবই অকিঞ্চিৎকর। ঐ সব তুচ্ছ জিনিসের চাইতে অনেক গুরুতর মনে হচ্ছিল রমেশকাকার জীবন-নাট্যের এই পরিসমাপ্তি।

পরিবারের মামা, দাদা, মেশোমশাইরা বারংবার দরজার কাছে মুখ বিষণ্ণ করে অস্থিরভাবে আনাগোনা করছিলেন। কিন্তু চিরদিনের অভ্যাস মতো সকলের সুখ-সুবিধাকে অবহেলা করতে রমেশকাকা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শ্রীমতীর সারা দেহমন অসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। দীর্ঘ পল্লবিত চোখ দুটিকে রমেশকাকার পাণ্ডুর মুখের উপর স্থির রেখে একভাবে সে আইস-ব্যাগটাকে ধরে বসে আছে। চোখের কোণে-কোণে অবসাদের ঘন ছায়া, ঘনকুঞ্চিত চুলের রাশি অযত্নে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, শ্যামল প্রশান্ত ললাটে বিরক্তির ছায়ামাত্র নেই। তবু সে বড় ক্লান্ত। রমেশকাকার নিষ্ক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে তার জীবনেরও প্রাচীন ও সুদৃঢ় ভিত্তি যে স্খলিত হয়ে পড়বে একথা ভাবারও তার অবসর হয়নি।
পাঁচদিন গত হয়েছে। এখন সন্ধ্যা। বাইরে অকাল বরিষণের ঘনঘটা। রমেশকাকা চোখ মেললেন, কাকে যেন খুঁজছেন। পাশের ঘরে পিয়ানোর ধারে বসে এলামাসি বেলামাসিরা তখন আসন্ন দার্জিলিঙ যাত্রার কথা আলোচনা করছিলেন। কোনো কালে মিলির আক্কেল হবে না। দার্জিলিঙে গিয়ে হোটেলে থাকা সেকি সোজা কথা! সঙ্গে যাব বললেই যাওয়া গেল আর কি! ওর মেয়েদের কথা ভাবলে অবশ্য মেয়েদের মন ভারি না হয়ে পারে না। কিন্তু অমন নির্লজ্জভাবে পেড়া-পেড়ি করলে রূঢ় উত্তর না-দিয়েও তো উপায় নেই! পাশের ঘরে আবার রমেশকাকার এই অবস্থা! অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে এলামাসি বেলামাসি তাড়াতাড়ি এঘরে এলেন। মিলিও উঠে এসে দরজার কাছে অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়াল। রমেশকাকার জীবনযাত্রা সব সময় সুনীতিসম্মত না হলেও তাঁর উইলখানা অকিঞ্চিতকর নয়!
শেষ হয়ে আসছিল। শ্রীমতীর শান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে ধরা পড়তেই রমেশকাকার দুই চোখ শেষবারের মতো কোমল হয়ে এল, সুস্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “শ্রীমতী, নিজেকে কখনো ফাঁকি দিস না।” তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে রমেশকাকার জীবনে যবনিকা নেমে এল। আত্মীয়স্বজনেরা যাঁর-যাঁর কর্তব্যপালনে তৎপর হয়ে উঠলেন তক্ষুনি। প্রয়োজনীয় যা-কিছু ব্যবস্থা, সব হয়ে গেল; শোকের উচ্ছ্বাসে আর পরলোকগতের প্রশংসায় বাড়ি মুখর হয়ে উঠল।

এতদিনে নিশ্চিন্ত হলেন এলামাসি বেলামাসি। তাহলে আর দিন বারো! শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে, উইল পড়া হয়ে গেলে, চেঞ্জে যাবার আর কোনো বিঘ্ন থাকবে না। এখন মিলির একটু সুবুদ্ধি হলেই হয়। দাদাকে যখন বিয়ে করেছিল তখনই মিলির ভাবা উচিত ছিল সব কথা। যথেষ্ট বয়সও হয়েছিল তখন, জানা উচিত ছিল সকলের অবস্থা সমান হয় না। সারা জীবনটা ঐ একভাবে কাটিয়ে দিল মেয়েটা—কি পেলাম না, কে আদর করল না, কোথায় আমায় ডাকল না—এই করে-করে। এককালে তো কনভেন্টেও পড়েছে, তবু কি জানে না যে অসন্তুষ্ট মানুষ সুখী হয় না কখনো?

এমন কত কথা এলামাসি বেলামাসির মনে এসে জমা হতে থাকে। কিন্তু মিলির কোনো সুবুদ্ধিই যদি না-থাকে, ওকে কে বোঝাবে? একমাত্র উপায় এ-ক'দিন শোকে মুহ্যমানা থেকে, শ্রাদ্ধের পর রাত্রিবেলা মিলির অগোচরে সরে পড়া। হল্ এন্ডার্সন থেকে এরই মধ্যে আবার গরম গেঞ্জিগুলি কিনে আনতে হবে। কি সুন্দর গেঞ্জিগুলি, হাতে গলায় সরু একটু লেসের মধ্যে দিয়ে শাদা রিবন চালানো। সুদৃশ্য, অথচ আধাবয়সী মহিলাদের ঠিক উপযোগী।

ছোটখাটো নানান দুশ্চিন্তা টেনে এনে প্রধান দুশ্চিন্তাটাকে সবাই আড়াল করতে চেষ্টা করলেও, প্রতি পলে, প্রতি পদে তা এসে প্রত্যেকের মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে—শ্রীমতীর কি হবে? মরণ-কালে আত্মীয়স্বজনের দিকে দৃকপাত না-করে শ্রীমতীকে শেষ ক'টি অর্থহীন কথা বলে রমেশকাকা তো প্রাণত্যাগ করলেন। এখন রমেশ-কাকার ছায়াচ্যুত শ্রীমতীর কি ব্যবস্থা হবে? যদি তিনি কর্তব্যজ্ঞান রহিত হয়ে, আত্মীয়স্বজনকে লঙ্ঘন করে, উইলে শ্রীমতীকেই—না, না, সে হতে পারে না। দীর্ঘজীবনে রমেশকাকা বহুবার সুবুদ্ধি

হারিয়েছেন, যেমন শ্রীমতী প্রসঙ্গে, প্রায় কুড়ি বছর আগে। কিন্তু কদাচ কর্তব্যজ্ঞান হারাননি। আত্মীয়স্বজন ভগবানের দান। শ্রীমতীর মতো যারা পৃথিবীর উপসর্গ, তাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না।
শ্রীমতীর খোঁজে এলামাসি বেলামাসি রান্নাঘরের দিকে চললেন। সিক্ত চুল আলগোছে বাঁধা, পরনে কালোপেড়ে তাঁতের শাড়ি, শ্যামল শ্রীতে ভাঁড়ারঘর পরিপূর্ণ করে শ্রীমতী রাশিরাশি তরকারি কুটছিল।
"শাদাসিধে রান্না দিচ্ছিস তো শ্রীমতী? সবারই কিন্তু নিরামিষ। ঠাকুরচাকর কেউ এ-ক'দিন মাছ-টাছ খাবে না। মনিবের প্রতি একটা শেষ কর্তব্য তাদেরও আছে, এটুকু তাদের শিখতে হবে। তুই এদিকে একটু নজর রাখিস কিন্তু।"
স্নিগ্ধকণ্ঠে সবুজ বনানীর অন্তরালে মর্মরধ্বনির মতো, শ্রীমতী বলল, "সকলের জন্যই নিরামিষ দিয়েছি, মাসিমা।"
এলামাসি বেলামাসি আসল কথাটা আর পাড়তে পারেন না। ছোট-খাটো অনেক প্রসঙ্গ তুলতে হয়। এলামাসিই শেষে বলেন, "আর দুদিন পরে আমরা তো যে যার নিজের সংসারে চলে যাব। তুই কি করবি, কিছু ভেবেছিস শ্রীমতী?"
শ্রীমতী নীরব।
"তুই তো জানিস, রমেশকাকার সঙ্গে আসলে তোর কোনো সম্পর্ক নেই। তোকে তিনি মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বি.এ. পাশ করেছিস, গান-বাজনা শিখেছিস, কাজকর্ম জানিস; যা-কিছু করা যায় সবই তিনি করেছেন, যদিও তাঁর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর তুই কি আশা করিস তাঁর কাছে?"
প্রশান্ত দুটি চোখ তুলে শ্রীমতী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, "আর কি আশা করব, মাসিমা? তিনি তো দেওয়া-নেওয়ার বাইরে চলে গেছেন, আর কি আমি আশা করব? টাকা-পয়সা? আমার নিজের দায়টুকু বইবার সামর্থ্য আমাকে তিনি দিয়ে গেছেন।"

বেলামাসি উদগ্রীব হয়ে বলেন, "কি দিয়েছেন তোকে? ছেলেপুলে নেই, তাই কাকিমার গয়নাগুলো সব তোকেই দিয়েছেন বুঝি? সে তো ঢের টাকার হবে!"

শ্রীমতীর ঠোঁটের কোণে মৃদু একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। "না, মাসিমা। আপনাদের তিনি কোনোভাবে বঞ্চিত করেননি। আমাকে স্বাবলম্বী হতে বলে গেছেন। বলে গেছেন জীবনে কখনো কারো কাছে যেন হাত না পাতি।"

এলামাসি বেলামাসিরা উঠে পড়েন, অপ্রসন্ন গলায় বলেন, "তোর ছেলেবেলায় তিনি যদি বলতেন একথা তবে তোর কি গতি হত বল্‌তো? এত যে গর্ব করছিস?"

শ্রীমতীর মনের ভাব যে-কোনো আশ্রিতের পক্ষে অযোগ্য এবিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। দুদিন ইস্কুলমাস্টারি করলেই রমেশকাকার পয়সায় কেনা ঐসব মিহি তাঁতের কাপড়ে সেজেগুজে গলাবাজি করা ঘুচে যাবে, দেখে নিও।

সকলের মনেই কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কথাবার্তা অসতর্ক হয়ে পড়ে। সবাই অসহিষ্ণুভাবে এই এগারোটা দিন কবে শেষ হবে তার প্রতীক্ষা করেন।

বিকেলের দিকে আবার শ্রীমতীর খোঁজ পড়ে। লকেট্ বকেট্ ভাঁড়ার-ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আসে তাকে। "মা ডাকছেন শ্রীমতীদি। আর ক'দিন নিরামিষ খাওয়াবে? প্রাণ যে হাঁপিয়ে উঠল।"

শ্রীমতী লকেটের চেয়ে কয়েক মাসের বড়, কিন্তু 'দিদি' শব্দের ব্যবধান অলঙ্ঘ্য। সেই অর্থে লকেট্‌ এখনো নাবালিকা। খাটো-খাটো কোঁকড়া চুল দুলিয়ে, শ্রীমতীর গলা জড়িয়ে ধরে, কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, "কেন ডেকেছেন জানো? শুভেন্দু আসছে আজ রাত্রিতে, তার সব ব্যবস্থা করতে হবে, ঘর ঠিক করে রাখতে হবে, খাবার আয়োজন করতে হবে। তোমার গা শিরশির করছে না, ভাই?"

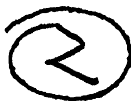
শ্রীমতী হেসে বললে, "গা শিরশির করবে কেন বল তো?"

"শুভেন্দুকে তুমি দেখনি তাহলে। সাক্ষাৎ একটি রাজপুত্র! মা-মাসিমা দুজনে ওর সঙ্গে সমান প্রেমে পড়েছেন বলে মনে হয়। সত্যি শুভেন্দুকে চেনো না তুমি?"

"নাম শুনেছি। দাদাবাবুর বন্ধুর ছেলে না?"

"আরে হ্যাঁ। রমেশদাদুর বন্ধুর ছেলে, তার উপরে ব্যারিস্টার। কাল যে দাদুর উইল পড়া হবে! শুভেন্দু আসছে শুনে পুতুল কি কাণ্ড করছে জানো না?"

লকেট্ সবিস্তারে সেই কাহিনী বলতে বসল।



সেদিন সন্ধ্যাবেলা শুভেন্দু পৌঁছল এসে। এলামাসি বেলামাসির পক্ষপুটে আচ্ছন্ন হবার আগে শ্রীমতী তার নবদুর্বাদল শ্যামশোভন রূপখানা একবার দূর থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সংসারের আবর্তে তখনই তাকে আবার ডুবে যেতে হল। শুনেছিল পরদিন প্রাতঃকালে রমেশকাকার পুরোনো লাইব্রেরিতে শুভেন্দু খসখসে পুরু কাগজে লেখা উইলখানির রহস্য উদ্ঘাটন করবে।

কিছুমাত্র ব্যাকুল হবার সুযোগ ছিল না শ্রীমতীর। এ-বাড়িতে ভোর না হতেই কাজের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করে, শ্রীমতী তাতে তেল যোগায়। এলামাসি ব্যস্তভাবে এসে বলেন, "ওরে শ্রীমতী, ছোড়দাদুর কাণ্ডখানা দেখ্ দিকিনি। বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে এসে উপস্থিত! সারা জীবনটা কেবল তো আমোদ করে কাটালেন। জানিস তো, ওঁর ছেলেমেয়েগুলোকে পর্যন্ত মানুষ করলেন একরকম রমেশকাকাই। কোনোদিন একটা কুটো ভাঙলেন না, খেলাধুলো, সিনেমা থিয়েটার, গানের মজলিস আর তাশের আড্ডা করে-করে জীবনটাই কাটিয়ে দিলেন। এখন উইলের নাম শুনেছেন, অমনি দিব্যি এসে উপস্থিত। কোনো-দিনও একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন না, যত ভাবনা-চিন্তা সব এর-ওর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে মাঝখান থেকে সরে পড়লেন; আর এখন বলেন কিনা রমেশকাকার সম্পত্তিতে ওঁরই দাবি সব থেকে বেশি, কেন না উনি হলেন সব থেকে নিকট আত্মীয়। কি করা যায় এখন বল্ তো?"

শ্রীমতী বললে, "ছোড়দাদু কোথায়? চা-টা খেয়েছেন?"
ত্রস্তপদে বেলামাসিও ভিজে চুল হাতে জড়াতে-জড়াতে এসে জলচৌকিতে বসে পড়েন।
"শুনলি তো শ্রীমতী! লোকটা চিরকেলে বদমায়েস। কী না করেছে, কী না খেয়েছে! তাই নিয়ে লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, আবার গর্ব করে বেড়ায়। আমাদের ওঁকে বলে কিনা হামবাগ্! আমাকে বলে কিনা অত পতিসেবা না করে যদি হতভাগার ইয়েতে দুটো লাথি কষিয়ে দিতাম নিজের এবং জগতের উপকার হত! উঃ! ওর সঙ্গে একঘরে বসাও একরকম অসম্ভব! আর সেই ভোর থেকে একটা শাদা জুতোয় পা গলিয়ে লাইব্রেরিতে ইজিচেয়ারে শুয়ে দিব্যি আরামে একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে। আর গুনগুন করে কি সব থিয়েটারি গান গাইছে।"
শ্রীমতী আবার জিগগেস করল, "এক পেয়ালা চা দেওয়া হয়েছে তো?"
এমন সময় লকেট্ খবর নিয়ে এল, "মা, শুভেন্দু কিন্তু সবাইকে লাইব্রেরিতে ডাকছে।"
এলামাসি বেলামাসি শ্রীমতীর প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়েই প্রস্থান করলেন।
নিজের ছোট পুবমুখী ঘরখানিতে গিয়ে মাটিতে আসন পিঁড়ি হয়ে বহুদিন পরে শ্রীমতী তার জিনিসপত্র গুছোতে বসল। এ-বাড়িতে তার পুরোনো স্থানটি স্খলিত হয়েছে। কত বছরের স্মৃতি এই ঘরটিতে পুঞ্জীভূত। ঘরের কোমল সবুজ দেয়ালগুলিও যেন কানে-কানে বলে, "একটুও কাঁদলে না, শ্রীমতী! ছি! কি কঠিন তুমি! তোমার পাট যে এবার উঠল। একটুও ভাবনা হচ্ছে না, শ্রীমতী?"
কতকালের পুরোনো স্টিল ট্রাঙ্কটার ডালা খুলে তার উপর সে ঝুঁকে পড়ে। এই ট্রাঙ্ক তার মায়ের ছিল। ভিতরকার জিনিস সব রমেশের

দান। বছরে-বছরে অযাচিতভাবে দুই হাত পূর্ণ করে কত দিয়েছেন। সে সব শুধুই কি জিনিস? তারপর চোখের সামনে দেখল ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস, প্রাণস্পন্দন থেমে গেল। নিজের হাতে ফুল দিয়ে সে খাট সাজিয়ে দিয়েছে। দাহ করে যারা ফিরে এল তাদের স্নানের জল আর গেলাশ ভরে সরবত তৈরি করে দিয়েছে, তবু কেন বুকের ভিতরটা একবার তার হাহাকার করে ওঠে না। কেন মনে হয় না—আমার সব গেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার আর নিজের বলতে কেউ নেই। তবু কেন রমেশ চৌধুরীর স্নেহ দিয়ে কানায়-কানায় মন ভরা থাকে?

বিষণ্ণমুখে মিলি এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

"আসুন মামিমা, এইখানে বসুন।"

মুখখানা হাঁড়ি করে মিলি বলে, "তুই এতও পারিস শ্রীমতী। ওরা নিচের ঘরে বসে তোর-আমার সর্বনাশ করছে তা জানিস? এলাদি বেলাদি কে কবে রমেশকাকার জন্য কি করলেন শুনি? এখন একবার ভাবখানা দেখ, ওঁদেরই যেন জমিদারি। বেশ হয়েছে ছোড়দাদু এসে। বলছেন—তোরা হলি রমেশের ভাইঝি, আমি সাক্ষাৎ খুড়ো। দেখিস তোদের কিছু দিয়ে যায়নি, সব আমার নামে লিখে গেছে। সে কি আর জানে না আমার কত খরচ! জানিস শ্রীমতী, ছোড়দাদুর সুটকেশ খুলে লকেট্-বকেট্‌রা দেখেছে একটা হুইস্কির বোতল ছাড়া ওতে কিছু নেই। এলাদি বেলাদি তো রেগে টং। আমাকে লাইব্রেরিতেই ঢুকতে দিল না ওরা। এলাদি বললেন, তোমার গুণধর স্বামীটি তো উপস্থিতই আছে, তোমার আবার নাক ঢোকাবার দরকার কি? এমন কথা কোথাও শুনেছিস? আসলে রমেশকাকা ওঁকেই বেশি ভালোবাসতেন বলে ওদের সব হিংসে। কত কাপড় তোর রে শ্রীমতী, কতদিন ধরে না-জানি জমিয়েছিস।"

ভরা মনে শ্রীমতী বলে, "বছরে-বছরে নববর্ষে, পুজোর সময়, বড়দিনে,

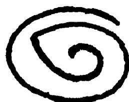
নিউ-ইয়ারে, সরস্বতীপুজোয়, দোলে, যখন-তখন নানা ছুতো করে এসব আমায় দিয়েছেন। কতবার বলেছি আমার অত কিছু দরকার নেই দাদাবাবু, অত দেবেন না আমাকে। হেসে বলেছেন, জানিস না, দরকারির চেয়ে অদরকারির দাম ঢের বেশি।"

মিলি বলে, "ট্রাঙ্কটা বড় সেকেলে, তোর মা'র বুঝি? মা-কে তোর নিশ্চয় মনে নেই, কতটুকু বা ছিলি তখন। আমার কিন্তু পদ্মাদিদিকে বেশ মনে আছে। কী রূপ ছিল তার। হাঁটু অবধি কালো কোঁকড়া চুল, পদ্মফুলের মতো গায়ের রঙ, তুই তার কিছুই পাসনি, শ্রীমতী। চোখ দুটি ছিল সত্যি কান পর্যন্ত টানা, কাজল দিয়ে তার উপরে খানিকটা আবার টেনেও রাখত পদ্মাদিদি। কপালে লম্বা করে একটা কাজলের টিপ পরত। জিগগেস করলে বলত, নইলে যে রূপ দেখে লোকে নজর দেবে।

"মনে আছে পুজোর সময় একবার আমরা সব এই বাড়িতে জড়ো হয়েছি, সবে আমার বিয়ে হয়েছে তখন। বিজয়ার দিন সকালে একটা ঠিকে গাড়ির মাথায় এই ট্রাঙ্কটা চাপিয়ে, তোকে কোলে করে পদ্মা-দিদি এসে উপস্থিত! থান পরা, দুখানা হাত খালি, দেখে আমরা তো অবাক! শুনলাম স্বামী মারা গেছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছে। আক্কেল দেখে সবার চক্ষু স্থির! তিনকুলে যার কেউ নেই, কি বলে সে চলে এল? এবাড়ির সঙ্গে তার কি সত্যি আবার কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি! রমেশকাকার স্ত্রীর কোন এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের তো মেয়ে। তা হলে কি হয়, এক ডালা রূপ নিয়ে—তুই তখন কোলে—এসে উঠলেন। কতই বা বয়স তখন, বড় জোর পঁচিশ। কত লোকে কত কথা বললে তা নিয়ে। কিন্তু রমেশ-কাকা তো কখনো কাউকে কেয়ার করতেন না, বললেন আমার কাছে যখন আশ্রয় নিয়েছে, ও এখানেই থাকবে। তা ছাড়া, দিস্ ইজ্ নান্ অফ্ ইয়োর্ ডার্ন বিজ্‌নেস্!"

হাত থেকে কখন রেশমী কাপড়খানা খসে পড়ে গেছে। মুগ্ধকণ্ঠে শ্রীমতী বললে, "তারপর কি হয়েছিল, মামিমা? দাদাবাবু আমার সঙ্গে সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতেন, কিন্তু মা'র নাম করলেই গম্ভীর হয়ে যেতেন।"

"সে এক কাণ্ডরে শ্রীমতী! রমেশকাকা তোর জন্য রেখে দিলেন বাঙালী ঝি, আর পদ্মাদিদিকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য এক মেম টিচার। সে কি আর পদ্মাদিদির ধাতে সয়। মাত্র এক বছর সে ছিল এ-বাড়িতে, সেই এক বছরেই রমেশকাকাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অর্ধেক চুল পাকিয়ে দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ পালিয়ে গেল। শুনেছি অ্যাকট্রেস বলে বেশ নাম করেছিল, নাম বদলে এখনো সিনেমা অ্যাকটিং করে, মা-মাসির পার্ট নেয়। দেখতেও ছিল খাসা, গলাও ছিল চমৎকার। ও কি তোর মুখ অমন শাদা হয়ে গেল যে? তুই জানতিস না তোর মা বেঁচে আছে?"



লাইব্রেরিতে একটা পিন পড়লে শোনা যায়।

দেয়ালভরা বইয়ের রাশি। সারা জীবন ধরে বেছে-বেছে রমেশকাকা এগুলি সঞ্চয় করেছেন। মেঝেতে ছাই রঙের গালচে পাতা। খাশ পার্শিয়া থেকে আনিয়েছিলেন। চামড়াবাঁধানো আরামকেদারা, রমেশ-কাকার কত শখের জিনিস। কোথাও একটু অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, মর্মরের নারীমূর্তি নেই। খোলা জানলা দিয়ে প্রভাতকালের রোদ এসে ঘরটিকে ভরে দিয়েছে, কিন্তু প্রাণে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। দেয়ালের সারি-সারি বই নির্বাক নিস্পন্দ।

উপস্থিত মানুষ ক'টির হৃদয়ে শান্তি নেই, রক্তস্রোতে স্বাচ্ছন্দ্য নেই। এলামাসি বেলামাসি রমেশকাকার পুরোনো মেহগেনির লিখবার টেবিল ঘেঁষে পাশাপাশি দুখানি কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছেন। অন্তরে ঝড় বইলেও শৈশবের শিক্ষা ভুলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। ঈষৎ প্রসন্নতাও ফুটে উঠেছে তাঁদের মুখে, কারণ মিলিকে আজ তাঁরা উইল শোনা থেকে বঞ্চিত করতে সফল হয়েছেন। তবে মিলির স্বামী, এলামাসি বেলামাসির দাদা, তাঁর ক্লিষ্ট অসন্তুষ্ট সৌন্দর্য নিয়ে রমেশকাকার প্রিয় আরামকেদারায় শোভা পাচ্ছেন। তাঁর পাশে রমেশকাকার অশান্তিকর কাকা হাতের সিগারেট পাশের ট্রেতে নামিয়ে রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বেলামাসি রুষ্টচিত্তে দেখলেন টালিগঞ্জের আত্মীয়স্বজনরা যাঁরা জীবন-

কালে কোনোদিনও রমেশকাকার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রক্ষা করেননি, কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়ে আজ এসে উপস্থিত।

বেলামাসি মনে-মনে হাসলেন! টাকার কি গুণ!

শুভেন্দু এসে লিখবার টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তার হাতে রমেশকাকার পুরোনো উইলখানা। কুড়ি বছর আগে রমেশকাকা এই উইল করিয়েছিলেন, তারপর কোনোদিনও পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাননি। শুভেন্দু উইল পড়ল না। সংক্ষেপে বলল, "জ্যাঠামশাই তাঁর প্রত্যেকটি সাবালক আত্মীয়কে পাঁচশো টাকা করে আশীর্বাদী দিয়েছেন। আর এ-বাড়িখানা এবং বাকি সম্পত্তি দিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণ-মিশনকে। এই নিন উইল, আত্মীয় বলতে যাঁদের বোঝাবে উইলেই তাঁদের নাম লেখা আছে। আর বলতে ভুলেই যাচ্ছিলাম, এই লাইব্রেরির সমস্ত বই তাঁর স্নেহের পাত্রী শ্রীমতীকে তিনি দিয়ে গেছেন।"

শুনে কারো মুখে কথা সরে না। সমস্ত সম্পত্তি শেষে রামকৃষ্ণ-মিশনকে! তাঁরা ভালো লোক হতে পারেন কিন্তু কাকিমার গয়নাগাঁটি, এই সব দামী-দামী আসবাব, গালচে, বাতি, এসব নিয়ে সাধুসজ্জনদের কোন কাজে লাগবে? জলের দরে বিকিয়ে দেবেন যে! রমেশকাকাকে এমন পরামর্শ কে দিল?

নীরবতা ভঙ্গ করে অবশেষে মিলির স্বামী অমরেশ কাষ্ঠ হেসে বললেন, "আমারই তা হলে জিত। গত বছর রমেশকাকা আমার বাইশ হাজার টাকার ধার শোধ করে দিয়েছিলেন। বিস্তর কটুকথা বলতেও ছাড়েননি! তবু আমারই জয় হল শেষ পর্যন্ত! যাই মিলিকে সুখবরটা দিয়ে আসি। কেউ কিছু না-পেয়ে তোমাদের সব হৃদয় ভেঙে গেছে শুনে নিশ্চয় সে মনে শান্তি পাবে!"

অমরেশ উঠে পড়েন। এলামাসি বেলামাসি ঝড়ের মতো মুখ করে শ্রীমতীর সন্ধানে চললেন।

টালিগঞ্জের আত্মীয়দের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু জিগগেস করল,

"শ্রীমতী মেয়েটি কেমন বলুন তো? এই আলাদীনের ধন—বইয়ের রাশি নিয়ে সে করবে কি?"

"কে জানে মশাই! আমি হলে তো বেচে দিতাম। পাঁচ-সাতশো তো নিশ্চয় উঠত," বিমর্ষ-মুখে টালিগঞ্জ উত্তর দিলেন।

টালিগঞ্জের গৃহিনী বললেন, "শ্রীমতী খাসা মেয়ে! রমেশমামার কি যত্নটাই না করেছে। ঐসব এলা-বেলারা দেখতেই ঐ, আসল কাজে ফাক্কা! আমি শ্রীমতীকে বলে দেব কয়েকটা শিশি-বোতলওয়ালা ডেকে পাঁচআনা সের দরে সব বই বেচে দিতে। পাঁচ-সাতশো কি গো! পাঁচ-সাত হাজার উঠে যাবে।"

শুভেন্দু হতাশ হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। তার শ্যামল রূপকে একটু ম্লান দেখায়।

কোথায় গেলেন জ্যাঠামশায়! সম্পত্তি বিলিয়ে দিলেন; লাইব্রেরির বইগুলি পর্যন্ত দান করে দিলেন। জীবন কাটালেন পড়াশুনো নিয়ে, অথচ একটা বই লিখে গেলেন না যাতে অমন অগাধ পাণ্ডিত্যের একটু-খানি অংশও লিপিবদ্ধ হয়ে অমরত্ব লাভ করবে! দেহের সঙ্গেই যে-বৈদগ্ধ্যের অবসান কে জানে তার কোনো মূল্য আছে কিনা!

শুভেন্দু সংকল্প করল শ্রীমতী মেয়েটিকে জানতে হবে।

ওদিকে দোতলায় কোণের ছোট ঘরে এলামাসি বেলামাসি ঝড়ের মতো প্রবেশ করে স্তম্ভিত। "কি হয়েছে শ্রীমতী? মিলি, তুমি নিশ্চয় কিছু বলেছ ওকে! এখন আমাদের মন ভালো না, তুমি বাছা আর গোলমাল পাকিও না বলছি!"

মিলি অপ্রসন্নকণ্ঠে বলে, "কী তোমাদের কথা! আমি আবার কবে কিসের গোলমাল পাকালাম! কথায়-কথায় ওর মা'র কথা উঠল, তাই। বিশেষ কিছু এমন বলিনি, সবাই তো সে-কথা জানে বলেই জানতাম, কিন্তু—"

বেলামাসি অসহিষ্ণুভাবে বাধা দেন। "তুমি থাম তো মিলি! শ্রীমতী,

তুই নিশ্চয় উইলের কথা জানতিস, জেনেও এতদিন গোপন করেছিস!" এতক্ষণে শ্রীমতীর কণ্ঠে ভাষা ফিরে এল। ক্লান্ত গলায় বলল, "আমি শুধু জানতাম দাদাবাবু আমাকে কিছু দিয়ে যাবেন না। আর কিছু কখনো জিগগেস করিনি।"

"রমেশকাকা তাঁর বিষয় সম্পত্তি সমস্ত রামকৃষ্ণ-মিশনকে দিয়ে গেছেন, তুই সত্যি জানতিস না? কুড়ি বছর ধরে তাঁর ছায়ায়-ছায়ায় বাস করেছিস, তাঁর এই মনের কথাটা তুই জেনে নিসনি বলতে চাস? তবে তা হতেও পারে! জানলে কি আর দিনরাত অমন সেবা করতে পারতিস?"

খুশি হওয়ার চেষ্টা করে বেলামাসি সহসা বললেন, "রসবোধ আছে বেশ! আমাদের প্রত্যেককে পাঁচশো টাকা করে দিয়ে গেছেন! তোকে দেননি। তোকে দিয়ে গেছেন লাইব্রেরির ঐ বইগুলো। বেচে কিছুদিন খেতে পারবি!"

বিস্ময়ে দুই চোখ বড় করে শ্রীমতী বললে, "সমস্ত বই! আমাকে দিয়ে গেছেন দাদাবাবু?" এতক্ষণে তার দুই গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। চোখের জল মুছবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না-করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। অধরপ্রান্ত কোমল হয়ে এল।

"আমি বই ভালোবাসি, তাই দাদাবাবু আমাকেই সব বই দিয়ে গেছেন।" তার মনে হতে লাগল একটু আগে বুকের মধ্যে যে-হাহাকার করে উঠেছিল, যে-অপার শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল মন, সে-সবই অকিঞ্চিত-কর। দাদাবাবুর এমন স্নেহ যে লাভ করেছে হৃদয়ে তার কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই।

এলামাসি বললেন, "বই দিয়ে করবি কি? কে কিনবে বই? তাও যদি গল্পের বই হত!"

মুগ্ধকণ্ঠে শ্রীমতী বলল, "সারা জীবন ধরে পড়ব, বিক্রি করা কেন? ও কি বেচবার জিনিস!"

"রাখবি কোথায়? বাড়ি তো রামকৃষ্ণ-মিশনের! বাড়ি, বাগান, ফার্নিচার, যা আছে সব স্বামীজীরা নিয়ে নেবেন। তোর বই রাখবি কোথায় শুনি?"
খোলা দরজার বাইরে থেকে শুভেন্দু বলল, "যদি ঠাঁই না জোটে, আমার বাড়ি রয়েছে, সেখানে রাখা যায়। কিন্তু শ্রীমতী দেবী নিজে কোথায় যাবেন, কি করবেন, ভেবেছেন কিছু?"
শ্রীমতী উঠে, চোখ মুছে শুভেন্দুকে বসবার আসন দিল। কাছে থেকে দেখল তার নবদূর্বাদল শ্যাম শোভন মূর্তিখানি। তার মেঘমন্দ্রস্বরে কোমলতার আভাস শুনতে পেল।
শুভেন্দুও কাছে থেকে দেখল শ্রীমতীকে। এই সেই মেয়ে যার জন্য রমেশ-জ্যাঠামশাইকে কত নিন্দা সইতে হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের নিজ হাতে গড়া এই সেই শ্রীমতী যার ব্যবহার আশ্রিতের মতো নয়। কিন্তু ঐ গ্রীবাভঙ্গিটুকু? না, তার সবটা তো জ্যাঠামশাইয়ের হাতে গড়া নয়। খানিকটা সে সঙ্গে এনেছিল। এ যে মাতৃগর্ভ থেকে আনা। রক্তস্রোতে গোপনে বয়ে আসা। আবার মুক্ত ললাটের নিচে কালো দুই চোখে ও কিসের দীপ্তি? না, ওর সেই সুশ্রী দুর্বল মায়েরও সাধ্য ছিল না একে তৈরি করা। ও নিজেই বিকশিত হয়েছে।
শুভেন্দু আবার সেই প্রশ্ন করল, "আপনি এখন কি করবেন স্থির করেছেন?"
শ্রীমতী সহজভাবে বলল, "কেন, কাজ করব।"
শুভেন্দুর প্রশ্ন তবু শেষ হয় না : কি কাজ, কোথায় কাজ, কি কাজ শিখেছে শ্রীমতী? হাজার-হাজার মেয়ে বি. এ. পাশ করে। তারা কোথায় কাজ পায়?
এলামাসি-বেলামাসির এতটা ভালো লাগে না। চমৎকার ছেলে শুভেন্দু, কি সুন্দর দায়িত্বজ্ঞান! কিন্তু শ্রীমতীর জন্য ওর আবার অত কিসের ভাবনা? আমরা সবাই কি মরে গেছি? তবু বড় ভালো ছেলেটি,

লকেট্ যদি—পুতুল যদি—না! হবার থাকলে হবেই, চেষ্টারও ত্রুটি থাকবে না।

বেলামাসি কথা পাড়লেন, "কিছু যদি মনে না করিস শ্রীমতী, তো একটা কথা বলি।"

"কি কথা মাসিমা, কিছু মনে করব কেন?"

"দ্যাখ্, আমার ননদ চারুশীলাদিকে জানিস? ঐ যে দার্জিলিঙে থাকেন, প্লেন্স-এ এলেই মাথা কেমন করে। তুইতো চিনিস ওঁকে! চারুশীলাদি একটি সঙ্গিনী খুঁজছেন। নিজের মেয়ের মতো কাছে-কাছে থাকবে, দেখা-শোনা যত্ন-টত্ন করবে। বই-টই পড়ে শোনাবে, সেবা-টেবা করবে। তুই খুব পারবি। দেখেছি তো, রমেশকাকার জন্য কি না করলি তুই! তা একশো টাকা মাইনে দেবেন, কোনো খরচ নেই। আমি তো বলি তোর বেশ ভালোই হয়। বলিস তো আজই খবর নিই। দার্জিলিঙের মতো জায়গায় থাকতে পারাটাই তো একটা ভাগ্যের কথা।"

শুভেন্দু বলল, "কিন্তু উনি যদি আরও পড়াশুনা করতে চান তা হলে—"

এলামাসি বাধা দিয়ে বললেন, "আর পড়ে কি হবে, শ্রীমতী? এইবার সবাইকে দেখিয়ে দে রমেশকাকা তোকে কেমন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন! এই তো একটা সুবর্ণ সুযোগ!"

শান্তকণ্ঠে শ্রীমতী বলল, "আপনারা তাই যদি ভালো মনে করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

কথাটা যেন উঠবামাত্র পাকাপাকি হয়ে গেল। শুভেন্দু ব্যারিস্টার মানুষ, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত ওর ভালো লাগে না। শ্রীমতীকে বলে, "একটু ভেবে উত্তর দিলে পারতেন। জীবনে বড়-বড় সংকল্পগুলোর ভালোমন্দ আগে বিচার করে তবে মন স্থির করতে হয়। বড়লোকের সঙ্গিনী হওয়া যত সহজ মনে করছেন তত সহজ নয়।"

এলামাসি মৃদু হেসে বললেন, "বড়লোকের সঙ্গিনী ও তো চিরকালই হয়ে আছে। রমেশকাকা কি গরীব লোক ছিলেন নাকি?"

শ্রীমতী ক্লান্তভাবে বলল, "না, মাসিমা, আমি মন স্থির করেছি। আপনি আপনার ননদকে চিঠি লিখে দিন।"

"ভালোই হল একদিক দিয়ে। তুই আমার সঙ্গেই তাহলে যেতে পারবি। আমরাও যে ক'দিন বাদেই দার্জিলিঙ যাচ্ছি। লকেট্রা তো আজও বেরোল কি সব কিনতে-টিনতে! ওদের নিয়ে কোথাও যাওয়াই একটা ঝকমারি। তুই থাকলে সুবিধাই হবে।"

"বেশ তাই যাব।"

শুভেন্দু একটু ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল, "আপনার বইয়ের ভার আমি নিলাম। বেছে কয়েকখানা সঙ্গে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়? বাদবাকি আমি যত্ন করে রেখে দেব।"

বিদায় নিয়ে শুভেন্দু চলে গেল। এলামাসি বেলামাসি শ্রান্তভাবে শ্রীমতীর খাটের উপর বসলেন।

"চমৎকার ছেলে শুভেন্দু। খালি একটু যেন বেশি কথা বলে। ভগবান যেন ওকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা চালাবার ভার দিয়েছেন।" বলতে বলতে নিজের অজান্তেই শ্রীমতীর খোলা বাক্সের উপর চোখ পড়ে। "কত কাপড় জমিয়েছিস রে শ্রীমতী। দার্জিলিঙে তোর কাজ দেবে। এই সবই কি রমেশকাকার দেওয়া?"

হেসে শ্রীমতী বলল, "আমার যা-কিছু দেখছেন, যেখানে আমার যা-কিছু আছে, সবই তাঁর দেওয়া।" বাক্সের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শ্রীমতী কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখতে লাগল। "যেখানে যখন গেছেন আমার জন্য জিনিস নিয়ে এসেছেন, কাশ্মীর থেকে এই খোদাই-করা বাক্স, জয়পুর থেকে এই মিনে-করা ফুল, সুরাট থেকে শাড়ি, মাইশোর থেকে চন্দনকাঠের কৌটো। যেখানে যা ভালো পেয়েছেন এনে দিয়েছেন। পাওয়ার সাধ আমার মিটে গেছে।" বলতে-বলতে শান্ত শ্রীমতী যেন

প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠে : "বলতেন, ভালো জিনিসের যত্ন করতে হয়, সুন্দর জিনিসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হয়। কিন্তু বেশি আসক্ত হয়ে পড়িসনে কখনো। যে-জিনিস এক কথায় দান করে ফেলতে পারবি না, সে জিনিসকে কাছে ঠাঁই দিবি না। কেমন সুন্দর কথা, না, মাসিমা?"

মিলি কখন আসর থেকে উঠে গেছে কেউ টের পায়নি। ফিরে এসে এতক্ষণে আবার সে নিচু মোড়াটিতে বসল। চোখে-মুখে একটা আত্ম-প্রসাদের ছাপ।

"আমরাও দার্জিলিঙ যাচ্ছি। রমেশকাকার পাঁচশো টাকা নিয়ে আমরাও দশদিনের জন্য ঘুরে আসব। আমার রিনিমাসিমার বাড়ি আছে জলাপাহাড়ে, থাকব সেখানেই। অবাক হচ্ছ নাকি? তোমরা ছাড়া আর যেন কাউকে দার্জিলিঙ যেতে নেই, না? উনি, আমি, নেলি আর ডলি, চারজনেই যাচ্ছি। নেলি ডলি বড় হল, ওদের তো এখন একটা চান্স দেওয়া আমাদের কর্তব্য।"

"বেশ তো বাপু, চান্স দাও না তাদের। কিন্তু দাদার বিষয়বুদ্ধিটা দেখে অবাক না হয়ে পারি না। যেই হাতে টাকাটা এল, অমনি, এলা-বেলা যাচ্ছে, অতএব আমাদেরও যাওয়া চাই! তার চেয়ে, মিলি, দু-একটা ধার-টার শোধ করে দিলে ভালো হত না?"

মিলি বলে, "জানি না বাবা, ধার-টারের কথা।"

একে-একে সকলে প্রস্থান করেন। বেলা বাড়ে। রমেশকাকার গৃহস্থালী শ্রীমতীকে আহ্বান করে—এস, এস, জন্মমৃত্যুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্রীমতীও নিচের তলায় নেমে যায়।

৪

ঝড়ে-ওড়া পাখির মতো যে যার উড়ে গেল। অবশেষে একদিন চাকর-দাসীকে বিদায় দিয়ে, সদর দরজায় তালা দিয়ে, শ্রীমতী চাবিগাছি তুলে দিল শুভেন্দুর হাতে। পুরোনো চাকর-দাসীকে বিদায় দেওয়া কি জিনিস যে দেয়নি সে বোঝে না। আশৈশব যাদের উপর নির্ভর করা যায়, ছেলেবেলায় যাদের হাতে গড়ানো জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটে, যাদের কাচাকাপড় পরে, যাদের পাতা বিছানায় শুয়ে, যাদের হাতের রান্না খেয়ে, ব্যথা পেলে যাদের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে, রাগ হলে যাদের উপর অত্যাচার করে, আনন্দ হলে যাদের সেই আনন্দের অংশ দিয়ে তিলে-তিলে বড় হওয়া যায়, টাকা দিয়ে তাদের বিদায় করার মধ্যে কত যে দুঃখ শ্রীমতী আগে কোনোদিন সে-কথা কল্পনাও করতে পারেনি। শুভেন্দু তাকে নিজের গাড়ি করে শিয়ালদা স্টেসনে নিয়ে এসে এলামাসি-বেলামাসির হাতে সমর্পণ করল। ততক্ষণে শ্রীমতীর সিক্ত চক্ষুপল্লব শুকিয়ে গিয়েছে, পাংশু মুখচোখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। রেলগাড়ির কামরায় মালপত্রসহ তাকে তুলে দিয়ে শুভেন্দু লকেট্ আর পুতুল, দুজনকে দুবাক্স চকোলেট উপহার দিল। বাক্সের ঢাকনিতে লাল রিবন দিয়ে আঁকা বিড়ালাক্ষী সুন্দরী। এলামাসি বেলামাসি তৎক্ষণাৎ গলে জল হয়ে গেলেন। রিবন-বাঁধা মেমসাহেব দেখে অদূর ভবিষ্যের কি যেন সুখস্বপ্নে ডুবে গেলেন তাঁরা।

তাড়াতাড়ি শ্রীমতীকে জিগগেস করলেন, "আমাদের জন্য লুচি-তরকারি

এনেছিস তো? জানিসই তো তাড়াহুড়োতে খেলে আমাদের শরীর খারাপ হয়। কাল সকালের জন্য ডিমসিদ্ধ এনেছিস? আমরা কিন্তু রুটি-মাখন ছাড়া কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারিনি। এই লটবহর সামলানোই এক ব্যাপার। তা ছাড়া টিফিন-ক্যারিয়ার দেখতে এমন বাঙালী-বাঙালী লাগে, বিশ্রী। কখনো নিয়ে বেরুই না।"

লকেট্ আর পুতুলের কলকণ্ঠের বিরাম নেই। "শুভেন্দুদা, তুমিও এস নিশ্চয়। যেই ছুটি হবে নিশ্চয় নিশ্চয় আসবে।"

শুভেন্দু হেসে উত্তর দেয়, "নিশ্চয়, নিশ্চয় আসব। হোটেলে জায়গা হবে তো? যা তোমাদের লটবহর।"

বকেট্ আর অতুল নিজেদের অনাবশ্যকতা উপলব্ধি করে শ্রীমতীর কাছে সান্ত্বনা খোঁজে। তাদের সঙ্গে কথা বলে শ্রীমতীরও মনটা লঘু হয়ে আসে। কণ্ঠস্বর পুনরায় সহজ হয়।

ট্রেন ছাড়বার আগে শুভেন্দু একবাব শ্রীমতীকে বলেছিল, "শিলিগুড়ি থেকে আপনাদের মোটরে যাওয়া উচিত ছিল। রোজ ট্রেন লেট হচ্ছে, কাল বিকেল হয়ে যাবে পেঁছুতে।"

তার উত্তর দিলেন এলামাসি, বললেন, "মোটরে যাব কি! মোটরে যে আমাদের মাথা ঘোরে!"

বকেট্ও এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেয়ে বলল, "হ্যাঁ, মোটরও যেমন পাক খেয়ে-খেয়ে উপরে উঠতে থাকে, মা আর মাসিমার মাথার মধ্যেও পাক খেতে থাকে।" অতুলও গলা যোগ করল, "আবার ফিরবার পথেও মোটর যেমন পাক খেতে-খেতে নিচে নামতে থাকে, মা আর মাসিমার মাথার মধ্যেও পাক খেয়ে-খেয়ে শেষটা ভিরমি যান।"

এর বেশি বিদায় সম্ভাষণ করা হল না, ট্রেন ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় লকেট্ আর পুতুল শুভেন্দুর উদ্দেশ্যে এসেন্স-মাখা গোলাপী রুমাল ওড়াল। তারপর মাসিক পত্রিকা, চকোলেট আর মৃদুগুঞ্জনে মনোনিবেশ করল।

বেলামাসি শ্রীমতীকে কাছে ডেকে বসালেন, বললেন, "দে তো এইখানটা একটু টিপে। প্যাক করে শিরাটা টেনে ধরেছে। ভালো করে পা উঠিয়ে বোস না শ্রীমতী। চারুশীলাদির কাছে তুই ভালোই থাকবি। ওঁর স্বামী বছর আষ্টেক হল মারা গেছেন, বেশ ভালো অবস্থাতেই রেখে গেছেন। চারুশীলাদির মেয়ে মিনিকে দেখেছিস কখনো? কি রূপ ছিল যে তার এককালে! আসবে শুনছি, দেখিস তাকে। ওকে দেখে তুই অনেক শিখতে পারবি। দেখবি বিয়ে-থা না করেও মানুষ বেশ জীবনটা উপভোগ করতে পারে। তোর স্বাস্থ্য ভালো, লেখাপড়া শিখেছিস, নাই বা বিয়ে করলি। রমেশকাকাও নিশ্চয়ই এই কথাই বলতেন। বিয়ে করে তোর মা'র কি সুখটা হয়েছিল বল্ তো? বেশ আছিস, আর ও-সবের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করিস না।"

মুখ তুলে বেলামাসির মুখের উপর উন্মুক্ত দৃষ্টি স্থাপন করে শ্রীমতী বলল, "মাসিমা, আমার মা কোথায় আছেন?"

কামরাশুদ্ধ সকলে যে-যার কাজ ফেলে বেলামাসির উত্তরের প্রতীক্ষা করে রইল। বেলামাসি মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। এলামাসি হাতের কাগজখানা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "শ্রীমতী, তুমি মনে করবে তোমার মা নেই।"

মা নেই। মা নেই। মা তো ছিল না কখনো। কোনো শৈশবের স্মৃতি কোনো কোমল-নয়না মাকে জড়িয়ে থাকে না তো। ক্লান্তিতে সহসা মন তার ভরে যায়।

এলামাসি তখন বেলামাসির দিকে একটু ভ্রূকুটি করে সে-রাতের মতো শুয়ে পড়ার প্রস্তাব করেন।

গাড়ি যখন দার্জিলিঙে পৌঁছল সত্যিই তখন বিকেল হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারদিকে অসময়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

এলামাসি বেলামাসির চিত্ত হোটেলে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে গরম চায়ের জন্য ব্যাকুল। তারই মধ্যে আবার শ্রীমতীকে চারুশীলাদির বাড়ি পেৌঁছে দিতে হবে। সকলেই বিরক্তি বোধ করে। চারুশীলাদির বাড়ির সামনে রাস্তার উপর একফালি বাগান, সেখানে অজস্র বিলিতী ফুলের বাহার, দরজার উপর পুষ্পিত লতা উঠেছে, শাদা দেয়াল, সবুজ দরজা-জানলা, লাল টিনের ছাদ। দেখে শ্রীমতীর ভালো লাগে।

সদর দরজায় নেপালী বেয়ারা থাকে, তার জিম্মায় শ্রীমতীকে দিয়ে এলামাসি-বেলামাসিরা হোটেলাভিমুখে চলে গেলেন। বড় দেরি হয়ে গেছে। বাক্স-বিছানা নামিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছে কুলি মেয়েটি। শ্রীমতী তাকে পয়সা দিয়ে বিদায় দিতে যাচ্ছিল, বেয়ারা বাধা দিয়ে জানাল, বাক্স-বিছানা ঘরে তোলা কুলির কাজ, বেয়ারার কাজ নয়। অবশেষে কুলির সাহায্যেই বাক্স-বিছানা ঘরে তোলা হল।

মাঝখানে লাল গালিচা-মোড়া প্যাসেজ, তার ওপারে বসবার ঘর থেকে চারুশীলাদি বেরিয়ে এলেন। শ্রীমতীকে দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নকণ্ঠে বললেন, "এসে পেৌঁছুলে তাহলে! দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম কি হল!"

শ্রীমতী তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শান্ত গলায় বললে, "ট্রেন বড় দেরি করে এল মাসিমা। আমরা সোজা স্টেসন থেকে আসছি।"

"আচ্ছা, তুমি বাছা এখন তোমার ঘরে যাও, বেয়ারা দেখিয়ে দেবে। হাত-মুখ ধুয়ে বসবার ঘরে এস। কয়েকজনকে চা খেতে বলেছি, দেরি কোরো না। কাজে-কর্মে সময়মতো যারা চলে না, কখনো তারা কৃতকার্য হয় না।"

গরম জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মনে হচ্ছিল ছোট লোহার খাটখানিতে বিছানাটি পেতে, সাত-আট ঘণ্টা পড়ে-পড়ে ঘুমোলে বুঝি তার ক্লান্তি ঘুচবে। কিন্তু চারুশীলাদি অপেক্ষা করে রয়েছেন, তিনি কি মনে করবেন! একখানা ফিকে সবুজ রেশমী-শাড়ি বের করে সে পরল, গাঢ় সবুজ পশমের বোনা একটা জামা গায়ে দিয়ে, কোঁকড়া চুলের মধ্যে

দিয়ে দুবার চিরুণী চালিয়ে, মুখে একটু পাউডার মেখে প্রস্তুত হল। আর তো দেরি করবার কোনো কারণ নেই, ধীর পদক্ষেপে বসবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল শ্রীমতী।

দরজায় লাল মখমলের পর্দা ঝুলছে, তার ধারে-ধারে সোনালী ঘুণ্টি লাগানো। চারুশীলাদির তীক্ষ্ম দৃষ্টি তখুনি আবিষ্কার করে ফেলল তাকে। "এস, ভিতরে এস। এত লজ্জার কোনো মানেই হয় না, শ্রীমতী।" শ্রীমতী তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

চারুশীলাদির বয়স বছর বাষট্টি হবে। এখনো যত্নে বিন্যস্ত চুলের প্রাচুর্য দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। শাদায়-কালোয় মেশানো মাথাভরা একরাশি চুল। মিহি শাদা জর্জেটের থান পরা, শাদা জর্জেটের কারু-কার্য-করা জামা, শাদা কাশ্মিরী কোট। চোখে পুরু কাঁচের বিনা-ফ্রেমের চশমা। দীর্ঘ চেহারার মানুষটি, কোথাও যেন একটু দুর্বলতা বা অবসাদ নেই।

কক্ষে আরও ছয়টি প্রাণী, চায়ের অতিথি। চারুশীলাদি পরিচয় দিলেন তাদের কাছে।

"এই যে শ্রীমতী, যার কথা বলছিলাম।"

হাত তুলে শ্রীমতী নমস্কার করল তাঁদের। ছ'জোড়া প্রবীণ চক্ষু বিজ্ঞভাবে নিরীক্ষণ করল তাকে।

চারুশীলাদির সামনে নিচু কাশ্মিরী টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। ডিমের খোলার মতো মিহি পেয়ালা পিরিচ, ছোট-ছোট রুপোর চামচ, হাতলে বেঁটে বামুন খোদাই করা, রেশমী বালিশে মোড়া ভারি রুপোর চা-দানী, সূক্ষ্ম সূচের কাজ-করা দুগ্ধশুভ্র ট্রের আবরণ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে পড়ে দাদাবাবু এই রকম ভালোবাসতেন, সূক্ষ্ম সুন্দর শিল্পের শ্রী।

চমক ভেঙে শুনল চারুশীলাদি বলছেন, "শ্রীমতী, আমি চা ঢালি, তুমি ওঁদের দাও।"

পরিবেশনে ত্রুটি হয় না। কিন্তু সে মনে-মনে ভাবে আধারের তুলনায় আহার্যের পরিমাণ যেন অপ্রচুর। সোফার কোনা থেকে মেমসাহেব আকৃতির প্রৌঢ়া শ্যেনদৃষ্টিতে যেন তার হাতের আহার্য পর্যবেক্ষণ করছেন। শ্রীমতীর বুক দুরু-দুরু করে। কি জানি, গৃহকার্যে নিপুণ তার হাত দুখানি কেন যেন আজ শিথিল হয়ে আসছে।

শ্রীমতী এবং চায়ের আগমনে কথার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বহু চায়ের আসরের অভিজ্ঞ অতিথিরা ছেঁড়া সুতো আবার জোড়াতালি দিয়ে দেন। মেমসাহেব তাঁর জানোয়ারের লোমগুলোকে ঈষৎ সরিয়ে শ্রীমতীকে বসবার জায়গা করে দেন। শ্রীমতীর হাতের চা ততক্ষণে হিম হয়ে গেছে।

প্রৌঢ়া মহিলাটি সুন্দরী কিনা সে ঠিক ধরতে পারে না। মুখে পাটকিলে পাউডারের প্রলেপ, ঠোঁটে একটু রঙের ছোপ, চোখের কোলে নীলচে ছায়া, লেস আর ইল্যাস্টিকে ছিপছিপে শরীরটি আঁটসাঁট, সমুদ্রের ঝিনুকের অন্তরের মতো হালকা গোলাপী আভার জর্জেট শাড়ি, গলায় এক ছড়া মুক্তো, কানেও দুটি ছোট-ছোট মুক্তো, মণিবন্ধে হীরে-বসানো হাতঘড়ি, শুকনো আঙুলে সুদৃশ্য হীরের একজোড়া আংটি। সুন্দরী না-ই বা বলে কেমন করে। তাঁর কোলে রাখা বেড়াল-মুখো হ্যাণ্ডব্যাগের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মনে-মনে শ্রীমতী প্রশংসা না-করে পাবে না।

চারুশীলাদিও সেইদিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে বললেন, "রিনি ডার্লিং, তুমি তো কতবার বারণ করেছিলে, এবার শ্রীমতীর সঙ্গে আলাপ করে দেখ দিকিনি মত বদলায় কিনা।"

নামটা চেনা-চেনা শোনায়। এই বোধ করি মিলিমামিমার রিনিমাসি। মহিলা ছ'ইঞ্চি লম্বা ছ'ইঞ্চি চওড়া, মিহি শাদা এক বস্ত্রখণ্ড বেড়াল-মুখো থলি থেকে বের করে, সযত্নে তা দিয়ে ঠোঁটের কোনা মুছে ফেললেন; খুবই সাবধানে মুছলেন, যাতে ঠোঁটের কারুকার্যে হাত না-

পড়ে। তারপর গোলাপী পালিশ লাগানো নখর-শোভিত আঙুল দিয়ে কালো একটি চশমার খাপ বের করলেন। অতঃপর রুমাল আর চশমার খাপ বেড়ালমুখো থলিতে তুলে রেখে সুদৃশ্য নাসিকার উপর চশমাটি বসিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রীমতীর সঙ্গে আলাপে নিবিষ্ট হলেন। অপর পাঁচজন অতিথির মধ্যে দুটি মহিলা আর তিনটি পুরুষ, তাঁরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের কথাবার্তা বন্ধ করে দর্শকমণ্ডলে পরিণত হলেন।

রিনি প্রশ্ন করলেন, "এর আগে তুমি কি কাজ করতে?"

শ্রীমতী স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, "গত বছর বি.এ. পাশ করেছি, তারপর থেকেই দাদাবাবুর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাঁরই দেখাশুনো করতাম।"

"তবে তো তোমার কোনো রকম ট্রেনিংই নেই? দেখ, চারুশীলা, দিল্লী না কোথায় যেন কলেজ খুলেছে ডোমেস্টিক সায়েন্সের; সে-সব ট্রেনিং না-নিয়েই কাজে ঢোকাটাকে আমি মোস্ট ডিজাস্ট্রাস্ মনে করি। তুমিও দেখে নিও।"

চারুশীলাদি কাশ্মিরী কোটের গলার বোতাম আঁটতে-আঁটতে বললেন, "তোমার পপেট্‌কে তো কত রকম ট্রেনিং দিলে, সেই বা কি কাজের হল বল দেখিনি।"

রিনিমাসি নাক টেনে বললেন, "তোমার কোনো কমন্‌সেন্স নেই। পপেট্ বেচারীর শরীর মোটে ভালো না, কে না-জানে! তাছাড়া কাজ করবার এমন কি দরকারটাই বা তার পড়েছে শুনি!"

এই নিয়ে ঘোর তর্ক শুরু হয়ে যায়। শ্রীমতীর চোখ দুটি ক্রমে ঘুমে জড়িয়ে আসে। হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা লাগছে। নেপালী বেয়ারা এসে চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে ইলেকট্রিক হীটার লাগিয়ে দিয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঘরের মধ্যে চারদিকে পর্দা টানা। গোলাপী দেয়ালে গোলাপী শেড্ লাগানো বাতির স্তিমিত আলোর

ছায়া পড়েছে। একটা ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্যের, কোমল আরামের পরিবেশ। কিন্তু শ্রীমতীর মন এসব থেকে দূরে বাইরে কোথাও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডাক্তার সেন তাকেও তাঁদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে জড়াতে চেষ্টা করেন। "তোমাদের কলকাতার খবব বললে না? শুনছি সেখানে আহার, আচ্ছাদন আর আশ্রয় ছাড়া আর সবই আজকাল মিলছে? চাকর-বাকর নাকি লোপ পেয়েছে দেশ থেকে? দোকানদাররা ধর্মঘট করছে রোজ?"

শ্রীমতী এর কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তার উপর ভদ্রলোকের ধরন দেখে মনে হয় উক্ত অবস্থার জন্য ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতীকেই তিনি দায়ী বলে সন্দেহ করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজ মাহাত্ম্যে বহুক্ষণ হল ক্ষমাও করেছেন।

সুখের বিষয় বক্তা কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা করেন না, আপন মনে বলে যেতে থাকেন, "আমার মতে তোমরা মিস্‌ম্যানেজ করছ। আমি তো বলি ঘরকন্নার পাট তুলে দাও। সবাই হোটেলে থাকা অভ্যাস কর। ব্যস! চাকর আর র‍্যাশনের প্রব্‌লেম্‌ সল্‌ভড্‌! সারাদিন তখন বই পড়বে, সিনেমা দেখবে, সাজবে-গুজবে, লাইফ এন্‌জয় করবে।"

জীবনযাত্রার এমন সহজ একটা পন্থা বাত্‌লে দিলেন, শ্রীমতী তবু কোনো কথা খুঁজে পায় না।

মিসেস মালিক্‌ বলে আবেকজন সহসা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "স্পীকিং অভ্‌ সার্ভেন্টস্‌! চাকব ক্লাশটা লোপ পেলে তো বাঁচা যায়। হরদম তাদের আবদার লেগে আছে, মাইনে বাড়িয়ে দাও। প্রতিমাসে একদিন দুদিন ছুটি দাও। খাওয়া পছন্দ হয় না। দোষ করলে কিছু বললে একেবারে হাঁ-হাঁ কাণ্ড। এর শেষ যে কোথায় ভাবতে গা শিউরে ওঠে। যদি বা একটা ভালো চাকর জোটে তো পাঁচজন বন্ধুবান্ধব মিলে নানান লোভ দেখিয়ে তাকে ভাগিয়ে নেবে।"

মিসেস বাসুও যোগ করলেন, "সাহেবদের আমলে বাছারা জব্দ ছিলেন,

তখন তো সব সেলাম ঠোক! আর জুতো খাও! তবু তাই ওদের ভালো লাগত।"

টিপ্পনি কাটলেন মিস্টার বাসু, "উইক গভর্নমেণ্ট হলে যা হয়। যত সব হতচ্ছাড়া গরীব আর ইল্লিটারেট্‌দের দেখবে মুখ খুলে গেছে, অথচ সত্যিকারের মেরিট যাদের আছে তারা কোথাও পাত্তা পাবে না। আমাদের সুকেশের অবস্থাটাই দেখ না! দিল্লীতে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে ছেলেটা, আজে-বাজে কত লোক ভালো চাকরি পাচ্ছে, আর ওর বেলাতেই মাইনর জব্‌।"

হোস্টেস হিসাবে চারুশীলাদি ক্ষুব্ধ চিত্তগুলিকে শান্ত দানের চেষ্টা করলেন, "সমান বললেই তো আর সমান হয় না সবাই! ভগবান কিছু বড়লোক গরীবলোক আগে থেকেই সৃষ্টি করেননি। বড়লোকেরা যেমন নিজেদের তেমনি পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় বড়লোক হয়েছে। তাদেরই বা কে হতে বারণ করেছিল শুনি! তা না, গরীব হয়ে যেন আমাদের মাথা কিনে নিয়েছেন! ওরা খেতে পায় না অতএব সকলের পাঁচ পোয়া চাল বরাদ্দ! রিডিকুলাস্‌!"

সহসা প্যাসেজে একটি ছোটখাট প্রভঞ্জনেব সাড়া পড়ে গেল। বিচলিত বামাকণ্ঠ, ব্যতিব্যস্ত ভৃত্যসম্প্রদায়, বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসম্ভার, উৎক্ষিপ্ত কুক্কুরধ্বনি। কক্ষস্থ সকলের মধ্যে চোখে-চোখে কি কথা হয়ে গেল! চারুশীলাদির মুখখানা আসন্ন ঝড়েব রূপ ধারণ করল যেন। ধীরে-ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে বিদায় সম্ভাষণ শোনা গেল, কে যেন নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়, এবং এক রমণীমূর্তি প্রবেশ করে। ঢুকেই তীক্ষ্ণ কলকণ্ঠে বলে, "কি মা, ও রকম শক্‌ড্‌ হচ্ছ কেন? একটু খুশি হও।" বুকে জড়ানো কুকুর বাচ্চাকে সম্বোধন করে বলে, "বো-বো দেখ, তুই ছাড়া আর কেউ আমাকে দেখে খুশি হয় না! মা, আমি ফ্যামিশ্‌ড্‌! চা, স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ যা আছে দাও! তোমার একমাত্র সন্তানকে দেখে একটু আনন্দ প্রকাশ করলেই বা!" রমণী সোফার কুসনগুলিকে

গুছিয়ে জায়গা করে বসে পড়ে। চারুশীলাদি বেয়ারাকে চা আর খাবার আনতে ফরমায়েশ করে সোজা হয়ে বসে বলেন, "দেখ মিনি! জীবনটা একটা হিউজ জোক্ নয়। মানুষ হয়ে জন্মাবারও একটা উদ্দেশ্য আছে।"

মিনি এক গাল হেসে বলল, "আছে নাকি মা! স্টাফি ওল্ড্ মা! আমার মতে জীবনটা সত্যি একটা হিউজ্ জোক্! আমার মতেও তাই, আর ডাক্তার সেন আর মিস্টার বাসু আর শচীনমামার মতেও তাই!" চামচ দিয়ে চা নাড়তে-নাড়তে মিনি ষড়যন্ত্রকারীর দৃষ্টিতে সেন, বাসু আর শচীনমামার দিকে তাকাল। যেন আদেশ পেয়ে অতিথিরা একে-একে উঠে দাঁড়ালেন।

"চারুশীলা, মিনি, বাইরে এমন ফাউল ওয়েদার! আর থাকা নয়। এবার পালাই।"

তাঁদের বিদায় দিয়ে চারুশীলাদি ফিরে এলেন। এতক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত দেখায়, মনে হয় বাস্তবিকই বাষট্টি বছর বয়স হয়েছে তাঁর। ক্লান্ত দেহকে চেয়ারে নামিয়ে চারুশীলাদি বললেন, "তুমি আমার পার্টিটা নষ্ট করে দিলে, মিনি।"

শুনে মিনির আর ধৈর্য থাকে না, বলে, "ওঃ, তোমার মোল্ডি ওল্ড্ পার্টি! সত্যি ভালো লাগে মা? এখন আমি যদি একটা পার্টি দিতাম—"

"ভালো লাগে না মিনি। না, মনে আমার শান্তি নেই। থাক সে কথা, এস শ্রীমতীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। শ্রীমতী, এই আমার মেয়ে মিনি। খবরের কাগজে আর্ট ক্রিটিসিজম্ করে!"

"শ্রীমতী? ওহো! তোমার সেই কম্প্যানিয়ন? বেচারা শ্রীমতী! কম্প্যানিয়ন হওয়া কি সোজা কথা ভেবেছ? তোমাকে গম্ভীর হতে হবে, সৎ হতে হবে, জীবনে উদ্দেশ্য থাকতে হবে, তোমার. ষাট বছর বয়স হতে হবে! পুওর ওল্ড্ শ্রীমতী!"

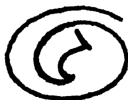
এতক্ষণে শ্রীমতী ভালো করে মিনিকে দেখল। কোনো মায়াবলে যেন পলায়মান যৌবনের অঞ্চল প্রান্তটি ধরে রেখেছে। আকর্ণ বিস্তৃত টানা-টানা চোখের কোলে গভীর কালিমা! বাঁশির মতো নাক, তার দুই পাশে বলিরেখা ঠোঁটের কোনা পর্যন্ত টানা। প্রাণের অতৃপ্তিকে চাপা দিতে পারেনি পুষ্প-পেলব অধরের নিপুণ প্রসাধন। জীবনে কখনো শ্রীমতী অমন সুন্দর কপাল অমন ধনুকের মতো ভুরু দেখেনি। যেন ঝরে পড়ার মুখে গোলাপ ফুল। বেশবাস সাজ-সজ্জায় একটা অযত্ন, একটা তাচ্ছিল্য, একটা শিথিলতা। জামার লাল রঙের আদি উজ্জ্বলতা চলে গিয়েছে। শাড়িখানাও ঘোর লাল রঙের, তাতে ইস্ত্রি নেই। আঙুর-গুচ্ছের মতো কোঁকড়া চুল মাথায় এলোমেলো।

শ্রীমতীর মনে হল, দাদাবাবু বলতেন, সুন্দর জিনিসের সেবা করতে হয়, কিন্তু কখনো পুজো করতে নেই। যার এত রূপ, জীবন তার বুঝি ধন্য হয়ে যায়।

“কি ? মনে ধরেছে ?” বাঁকা হাসিভরা চোখে মিনি তাকাল তার দিকে।

শ্রীমতী বড় অপ্রস্তুত বোধ করল। এর সঙ্গে সে কি কথা বলতে পারে ?

একটু পরেই চারুশীলাদি ক্লান্তস্বরে বললেন, “আমি শুতে যাচ্ছি। শরীর ভালো লাগছে না, রাতে আর খাব না কিছু। শ্রীমতী, সব দেখেশুনে নিয়ে খেও। কাল থেকে তোমার ডিউটি শুরু হবে। আর মিনি, আজকের মতো ক্ষান্তি দাও।”



দিন কুড়ি-বাইশ কেটে গেছে। চারুশীলাদি তাঁর ভাঁড়ারের চাবি আর সমস্ত সংসারের ভার শ্রীমতীর হাতে তুলে দিয়েছেন। দার্জিলিঙের ঘরকন্না শ্রীমতীকে নতুন করে শিখতে হয়েছে।

ঝড়ের মতো এক-একদিন মিনি এসে তার বুকের রক্তে দোলা দিয়ে যায়। "ঘরকন্না তোমার ভালো লাগে শ্রীমতী? মনে হয় না জীবনটাকে বৃথা নষ্ট করে ফেলছ? দেখ, আমার শাড়ির পাড়টা এইখানে কতটা খুলে গেছে, একটু সেলাই করে দেবে? এক্ষুনি আমাকে বেরোতে হবে কিন্তু। পারও বাপু তুমি!" গানের সুর গুনগুন করতে-করতে শ্রীমতীর মনে নিভৃত কক্ষের দরজায় এক-একবার সে যেন টোকা দিয়ে যায়, কানে কানে যেন নিঃশব্দ গলায় বারবার বলে, ও শ্রীমতী, এ তুমি করছ কি? বাজারের ফর্দ লিখে ধোবার হিসেব মিলিয়ে জীবনটাকে নষ্ট করছ? কতবার তাকে রমেশ চৌধুরীর শেষ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোথায় কত রাত্রিতে বাজনা শুনে আসে, নতুন প্রকাশিত গোছা-গোছা ইংরিজি বই হাতে করে যখন-তখন বাড়ি ফেরে, শ্রীমতীর কর্মরত হাত দুখানির দিকে কেমন যেন কটাক্ষ করে, নীরব ভাষায় বলে যেন, শেষে কি সত্যি নিজেকে ফাঁকি দিলি শ্রীমতী?

খাঁচার পাখির মতো শ্রীমতী ডানা ঝাপটায়, হিমালয়ের নৈর্ব্যক্তিক রূপরাশি তাকে শান্তি দিতে পারে না। বেড়াতে যাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে এলামাসি বেলামাসি মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যান। গৃহকর্ত্রীর আদেশে

শ্রীমতী তাঁদের বৈঠকখানায় বসিয়ে, হীটার জেবলে দেয়, চা আর চীজ-টোস্ট করে খাওয়ায়। ছোট মোড়াতে পা দুখানি তুলে দিয়ে, শাদা আলোয়ানে আবৃত হয়ে চারুশীলাদি তাদের নানান কুশলপ্রশ্ন করেন। লকেট্রা আসে না কখনো, দূর থেকে মাঝে-মাঝে রঙিন রুমাল নাড়ে, পথে দেখা হলে সাদর সম্ভাষণ করে। ব্যস্।

রাত্রে শোবার আগে চারুশীলাদির জন্য নিজের হাতে শ্রীমতী ওভ্যালটিন করে নিয়ে যায়। পেয়ালা হাতে হীটারের পাশে আরাম-কেদারায় তিনি বসে থাকেন, রুপো বাঁধানো নরম বুরুশ দিয়ে তাঁর রেশমী চুল বুরুশ করে দিতে হয়। ক্লান্তস্বরে তিনি সংসারের সারাদিনের প্রতিটি খুঁটি-নাটির সংবাদ নেন। অনর্গল কথা বলে যান, কতকটা স্বগত, কতকটা শ্রীমতীকে উদ্দেশ করে। শ্রীমতী কি বলবে? কিছুই বলে না।

"মিনি এখনো ফেরেনি শ্রীমতী? খেয়ে নিয়ে তুমি শুয়ে পড়বে নাকি? রাত তো কম হল না! সদর দরজা খোলা থাকবে? তাই থাক। চাকরদের বেশিক্ষণ কিন্তু বসিয়ে রেখ না, গোলমাল করবে আবার। জানোই তো, আজকাল পক্ষীরাজ ঘোড়া মেলে তো ভালো চাকর মেলে না। বরং এক কাজ কর, কাপড় ছেড়ে, চুল বেঁধে আমার এই গরম ড্রেসিং গাউনখানা গায়ে দিয়ে তুমি বৈঠকখানার সোফাতেই শুয়ে থাক; এলে তুমিই দরজা খুলে দিও। দেখেশুনে না-দিলে কি আর খাবে? যা পিটপিটে মেয়ে। আমার জীবনে আর কোনো শান্তি নেই, শ্রীমতী! তাই ভাবি, তোমার মা থাকলে তাঁর কোনো ভাবনাই থাকত না, তুমি বেশ নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পার। মিনি আবার ঐ এক ধরনের। কাজকর্মও তো করছে, ঘুরে ফিরেও বেড়ায়—তাই বলে আবার ঘুরে বেড়ায় বলে যেন মনে কোরো না ও কাজ করে না—এখন ছুটিতে আছে, তাই! আর না-বেরিয়েই বা পারে কি করে, আজ এখানে চায়ে, কাল ওখানে লাঞ্চে, কেউ না কেউ ডাকছেই। খুব পপুলার মেয়ে! কোথাও লেকচার, কোথায় বাজনা, সবাই এসে ডেকে নিয়ে যাবে—নিজের

গানের গলাও খাশা। শুনো একদিন। কিন্তু কখন শুনবে? পায়ে যেন ওর পাখা বাঁধা, এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে না। কি যে আমি করব ওকে নিয়ে, কিছু বলতে গেলে আবার ফোঁস করে উঠবে। মা হওয়া কি কম শাস্তি! বিয়ের এত ভালো-ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, এখনো আসে; তা কাউকে পছন্দই হয় না! কিছুদিন ধরে আবার ঐ শুভেন্দু ছেলেটির সঙ্গে ভাব হয়েছে, দুজনেরই এক বিষয়ে ইন্টারেস্ট কিনা। আজ তো শুভেন্দুর আসবার কথা, সেই জন্যই বোধ করি দেরি হচ্ছে। গেছে হয় তো কোথায় তার সঙ্গে। তাতে এলাবেলারা মোটেই খুশি হবে না! ঐ যে অপগণ্ড দুটি মেয়ে আছে, তাদের নিয়ে ওদের যত রাজ্যের ভাবনা! এই তো মাত্র বি.এ. পড়ে, ওরা জানেই বা কি বোঝেই বা কি? কোন দিক দিয়ে যে ওরা শুভেন্দুর মতো ছেলের যোগ্য তা তো জানি না!"

শ্রীমতীর মন কথার স্রোতে কোথায় ভেসে যায়। মা থাকলেও শ্রীমতীর জন্য সে ভাবত না! কিন্তু কোথায় তার মা? চারুশীলাদি হয়তো জানতে পারেন? কিন্তু খোলাখুলি প্রশ্ন করতে পারে না। কে যেন তার মুখ বন্ধ করে দেয়। শুভেন্দু এসেছে? মিনি আর শুভেন্দুকে একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করে, পারে না। দুজনের এক ইন্টারেস্ট? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মনে হয় দুজনের দুই ভিন্ন জগৎ। তারা কি করে এক হবে? কানে যেন শুভেন্দুর মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের ক্ষীণ একটা প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে। কেন যেন মনটা তার হাল্কা লাগে। চারুশীলাদির চুল চিরে দুভাগ করে দুটি পরিপাটি বেণী বেঁধে তারপর দুফালি নীল রিবন বেঁধে দেয়। চারুশীলাদি শুয়ে পড়েন। এতক্ষণে ছুটি।

আলো নিবিয়ে বিদায় নিচ্ছে, চারুশীলাদি বললেন, "তুমি এখন কি করবে?"

শ্রীমতী প্রসন্নকণ্ঠে উত্তর দেয়, "আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন,

আমি বসবার ঘরে বসে একটু বই পড়ি না হয়, মিনিদি এলে এক সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে তবে শোব।" চারুশীলাদি খুশি হয়ে ক্লান্ত চোখ দুটি বন্ধ করেন।

নিজের ছোট কালো বাক্সখানা খুলে একখণ্ড ব্রাউনিং বের করে নিয়ে শ্রীমতী নিচে গেল। চাকরবাকরদের বসিয়ে রেখে মিছিমিছি আর কষ্ট দেওয়া কেন? মিনি এলে সে নিজেই খাবার গরম করে দিতে পারবে। রাত্রি অনেক হয়েছে। পড়ায় মন বসে না। কোলেব বই কোলে পড়ে থাকে, শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভাবনার স্রোতে মন তার কোথায় ভেসে যায়। কেন ঘোরে সংসারের চাকা? চারুশীলা-দির সচ্ছল সংসারের চাকাই বা কি উদ্দেশ্যে ঘোরে? মানুষ কেন জন্মায়? সাধু মহাপুরুষরাই বা কেন? পৃথিবীটাকে তো একতিলও বদলাতে পারেনি কেউ। লেখাপড়া-শেখা মানুষরা কি মুখ্যুদের চেয়ে সত্যি ভালো হয়?

বহুদিন পরে শ্রীমতী প্রাণভরে ভগবানকে ডাকতে পারল : দাদাবাবু বলতেন, তোমাকে ডেকে কোনো লাভ নেই, ডাকের অপেক্ষায় তুমি তো থাক না। তোমার সাড়া পাই না, প্রমাণ পাই না, আছ কি নেই তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু পৃথিবীর উপর আমার বিশ্বাস যেন স্থির থাকে। যেন বিশ্বাস করতে পারি এ-জীবন মঙ্গলময, এ-জন্মের নিশ্চয়ই নিগূঢ় কোনো উদ্দেশ্য আছে।

কত এলোমেলো কথা মনে পড়ে। বেড়ে চলে রাত। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে উঠে সে দরজা খুলে দিল। লাল শাড়ি পরা, লাল গরম ওভারকোট গায়ে মিনি, তার সঙ্গে শুভেন্দুই বটে। এক ফালি আলো এসে শুভেন্দুর মুখে পড়েছিল, মুখখানি একটু পাণ্ডুর মনে হয় তার। একজোড়া চোখের তীব্র চাহনি শ্রীমতীর মুখের উপর নিবদ্ধ হয়। নমস্কার করে শুভেন্দু জিগগেস করল, "কেমন আছেন শ্রীমতী দেবী? কাজ এখনো ভালো লাগছে?" কথার মধ্যে কোথায় একটা শানিত ছুরি

লুকিয়ে ছিল। এ তো সেই শুভেন্দু নয়! সে ছিল বজ্রের মতো কঠিন, কুসুমের মতো কোমল।
শ্রীমতীও নমস্কার করে, বলে, "ভালোই লাগছে।"
মিনি অস্থিরভাবে ডাকে, "এস শুভেন্দু, কফি খেয়ে যাও। শ্রীমতী চমৎকার কফি করে। ভিতরে এস, বড় শীত লাগছে।"
কিন্তু শুভেন্দু বাইরে থেকেই বিদায় নেয়, "না, আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে। শ্রীমতী দেবী বাড়িতে কাজকর্ম করবেন, আমরা বার্চহিলে বেড়াতে যাব। কিন্তু তোমার ঐ ক্ষুরতোলা জুতো পায়ে দিয়ে নয়।"
মিনি হেসে বলে, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে। চল শ্রীমতী, ক্ষিদে পেয়েছে।"
খেতে বসে বলে, "দেখ শ্রীমতী, রাঁধা-বাড়া, বাজার হিসেব, চাকর তাড়ানো, এ-ক'টা জিনিস জীবন থেকে যদি ছেঁটে ফেলতে না পার তাহলে আর সুখী হতে পারবে না।"
শ্রীমতীর ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে যায়, বলে, "ওসব যদি আমি ছেঁটে ফেলি মিনিদি, তোমারই অসুবিধা হবে সব চেয়ে বেশি।"
"রাবিশ! তোমার কোনো একটা ক্রিয়েটিভ কাজ করা উচিত। আচ্ছা, শুভেন্দুকে তোমার কেমন লাগে?"
শুভেন্দুকে শ্রীমতী কতটুকু চেনে? কি করে বলবে কেমন লাগে? বললে, "ভালোই লাগে।" ভালো লাগতে হলে চেনবার দরকার হয় না। না চিনলেই বরং বেশি ভালো লাগে।
মিনি বললে, "বেশ স্মার্ট, ব্যারিস্টারিতে এরই মধ্যে খুব নাম করেছে। ভারি কালচার্ড, জানো শ্রীমতী, ঢের পড়াশুনা করেছে। তবে ওসব লোকের একটা মুশকিল হচ্ছে যে সব জিনিসই যাচাই করে নিতে চায়। ওর মনে-মনে সব জিনিসেরই একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা আছে। ওসব লোকের ঐ একটা অসুবিধে।"

শ্রীমতী অবাক হয়ে শোনে।

"ও, ভালো কথা," কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যায় মিনির, "শ্রীমতী, তোমার একটা চিঠি এসেছিল আজ সকালে। ভুলে আমার চিঠির সঙ্গে দিয়ে গিয়েছিল ওরা, সারাদিন আমার ব্যাগে-ব্যাগেই ঘুরছে।"

লাল হ্যান্ডব্যাগ খুলে চাবি, রুমাল, লিপস্টিক, চ্যাপ্টা পাউডার-কৌটো, কাগজের কুচি, আরেকটা রুমালের ভিড় সরিয়ে ফিকে নীল রঙের একটি পুরু খাম বের করে মিনি শ্রীমতীকে দেয়।

লেফাপায় অপরিচিত হাতে শ্রীমতীর নাম-ঠিকানা লেখা। কেমন একটা মৃদু সুগন্ধও যেন শ্রীমতী অনুভব করল।

খাওয়া শেষ করে মিনি উঠে পড়ে। দরজা জানলা বন্ধ করে, আলো নিবিয়ে শ্রীমতী নিজের ঘরের আশ্রয়ে পৌঁছায়। কম্পিত হাতে খুলে ফেলে খামখানা। মাত্র একটি পাতায় চার-পাঁচ ছত্র চিঠি :

কল্যাণীয়াসু—তোমার অভিভাবকের মৃত্যুতে তুমি এখন আশ্রয়হীনা। অতএব তোমার সমুদয় ভার গ্রহণ করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি। তুমি পত্রপাঠ আমার কাছে চলে আসবার ব্যবস্থা করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি দেবে। ইতি—আশীর্বাদিকা তোমার মা, পদ্মাসনা দেবী।

মা! শ্রীমতীর মা। শ্রীমতীর রূপসী মা, যার গানের গলার তুলনা নেই! মা এতদিন পরে তাকে মনে করেছেন। কর্তব্য? কে বলেছে কর্তব্যের কথা? শেষ জন্মদিনে তার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে, আর তো কারো কোনো কর্তব্য নেই। শ্রীমতী নিজেই এখন নিজের কর্ত্রী। রমেশ চৌধুরী শ্রীমতীকে স্বাবলম্বী হতেই তো শিখিয়ে গেছেন।

মাথা উঁচু করে শ্রীমতী ছাদের নিচে ছোট গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। পরে চিঠিখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে, ক্লান্ত-ভাবে শুয়ে তখনই গভীর ঘুমে ডুবে গেল। ভাবতে পারেনি এই চিঠি নিয়ে পরদিন কত অশান্তির সৃষ্টি হবে!

পরদিন সকালে শ্রীমতীর ভাঁড়ারঘরের কাজ শেষ হয়ে গেছে। মিনি স্নান সেরে, সাজসজ্জা করে প্রাতরাশ করতে বসেছে। টেবিলের শেষ-প্রান্তে চারুশীলাদি যুগপৎ তার আহার পর্যবেক্ষণ এবং বেলা সাড়ে-ন'টায় খাওয়ার তিক্ত সমালোচনায় নিবিষ্ট আছেন। শ্রীমতীকে দেখে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার কথা ভেবে মিনি বললে, "কি শ্রীমতী! দিব্যি যে ভালোমানুষটি সেজে রইলে! কাল কে তোমাকে অমন গন্ধমাখানো চিঠিখানা লিখল, মাকে বলেছ?" হাল্কা সুরেই কথাটা মিনি তুলেছিল, পরিণামের কথা ভেবে দেখেনি। কিন্তু শ্রীমতীর প্রসন্ন মুখখানি সূর্যাস্তের বহুক্ষণ পর দিগন্ত যেমন বিবর্ণ হয়, তেমনি হঠাৎ শাদা হয়ে গেল। চেয়ারের পিছন দিক ধরে, মিনির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন চারুশীলাদি। আত্মসংবরণ করে শ্রীমতী চলে যাবার উদ্যোগ করতেই কর্কশ গলায় বললেন, "কার চিঠি, শ্রীমতী?"

শ্রীমতী নিরুত্তর।

"এখানে আমিই তোমার অভিভাবিকা। আমার প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া তো তোমার উচিত।"

শান্ত গলায় শ্রীমতী বলল, "আমার একুশ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে, মাসিমা। আমি নিজেই এখন আমার অভিভাবিকা।"

"কি আশ্চর্য শ্রীমতী! তোমাকে কত নম্র বলে মনে করেছিলাম। তোমার চিঠি আমি দেখতেও চাইনি। কে লিখেছে বললেই তো মিটে যায়।"

শ্রীমতী সংক্ষেপে বললে, "না। আমাকে মাপ করবেন।"

উত্তেজনায় চারুশীলাদি উঠে দাঁড়ালেন, কোল থেকে চশমার খাপখানা ঠক করে মাটিতে পড়ে গেল। নিচু হয়ে খাপটা শ্রীমতী তুলে রাখল টেবিলে। চোখে-মুখে চাপা কৌতুক নিয়ে মিনি অপেক্ষা করছে—কি হয়! এমন সময় রঙ্গমঞ্চে শুভেন্দুর প্রবেশ। হাওয়ায় একটা অস্বস্তি অনুভব করে অবাক হয়ে শুভেন্দু প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার

তাকাল। মিনি বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে যে? মা'র আরেকটি ক্লে-গডেস ধুলায় বিলুণ্ঠিত। টুকরোগুলি কুড়িয়ে দেবে না?" চারুশীলাদি ধৈর্য হারিয়ে, "ভালো লাগে না, মিনি," বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

শুভেন্দু মৃদু হেসে একটা চেয়ার ঠেসে বসল। শ্রীমতীকে জিগগেস করল, "ব্যাপার কি বলুন তো?"

শ্রীমতী কোনো উত্তর দেবার আগেই মিনি সহাস্যবদনে বললে, "শ্রীমতীকে কে যেন কাল এক চিঠি লিখেছে। এত মোটা খাম, আকাশের মতো নীল চিঠির কাগজ, তাতে গোলাপ-গন্ধ মাখা! শ্রীমতী কাল রাত্রে দরজা-জানলা এ'টে সেটির পাঠোদ্ধার করেছে, অথচ আজ কিছুতেই তার রহস্যটি খুলে বলছে না! মা এদিকে চিরটা কাল একাই সমাজকে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তিনি সইবেন কেন? বিশেষ করে শ্রীমতীর কাছ থেকে, যে আজ মাসখানেক হল মা'র বৃদ্ধ বয়েসের আদর্শ হয়ে বিরাজ করছিল! ওরে শ্রীমতী, তোর অমন সুখের চাকরিটা গেল। তুই এখন কর্বি কি?"

শ্রীমতী কিছু বলল না দেখে শুভেন্দু বলল, "কেন, একটা প্রাইভেট চিঠি দেখার মাসিমারই বা কি অধিকার আছে যে তার জন্যে ওঁর চাকরি যাবে? ও রকম চাকরি তাহলে না-করাই ভালো।"

মিনি কোনো বিষয়ে নিজের বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে আর তাতে বেশিক্ষণ মনোনিবেশ কবতে পারে না। উঠে গিযে সাইডবোর্ডের চৌকো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওভারকোট পরতে পরতে বলল, "আগাগোড়া ভুল বুঝেছ বন্ধু। আসলে শ্রীমতীর নৈতিক জীবনে মা'র যত না ইণ্টারেস্ট আছে, শ্রীমতীর উদ্ধত আচরণে ক্ষোভ হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি। আমি পর্যন্ত কত অছিলা অজুহাতে মাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলি, আর ও মা'র মাইনে-করা কম্প্যানিয়ন, ওর পরমাত্মাটাকে পর্যন্ত মা ভাড়া নিয়েছেন, ও বলে কিনা 'না, বলব না!' একি মা কখনো সহ্য করতে পারবেন!"

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল শ্রীমতীর শ্যামল মুখশ্রীতে কিসের যেন ছায়া পড়েছে। হাত দুখানি অনাবশ্যকভাবে দৃঢ়মুষ্ঠিতে চেয়ারটিকে আশ্রয় করে রয়েছে। কিন্তু শ্রীমতীর গ্রীবা এখনো নমিত হতে দেখল না। শুভেন্দু সহজভাবে হেসে তাকে আশ্বাস দিল, "কুছ পরোয়া নেই, শ্রীমতী দেবী। বাক্সপ্যাঁটরা বাঁধুন গিয়ে। আপনার এখানকার কাজ সাতদিনও টিকবে না, তাই নিয়ে বকেট্ আর অতুল বাজি ধরেছিল। তাছাড়া বেলামাসির পালা শেষ হয়েছে। এবার এলামাসির পালা। আপনার চাকরি-নম্বর-টু-ও ঠিক হয়ে রয়েছে। দামোদর নদীর ধারে চাঁপডাঙা গ্রামে, মেয়েদের নতুন হাইস্কুলে। এলামাসির বান্ধবী মিস বিশ্বাস সেখানকার হেডমিস্ট্রেস। অঙ্ক কষাতে হবে আপনাকে, আরো বাংলা-টাংলা কি সব পড়াতে হবে। যান না একবার হোটেলে এলা-মাসির মন ভালো করে দিয়ে আসুন। চারুশীলা দেবী ছুটি দেবার আগেই নিজেই ছুটি নিয়ে সরে দাঁড়ান। চলো মিনি, রোদে বেশি হাঁটতে পারব না বলে দিচ্ছি।"

মিনির সঙ্গে শুভেন্দু বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে শ্রীমতীর মনে পড়ল তার সঙ্গে একটি কথাও আজ বলা হয়নি।

বাবুর্চিকে রান্না বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীমতী সত্যিসত্যিই এলামাসির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।



এবার শ্রীমতী দড়ি-দড়া কেটে সত্যি-সত্যিই সংসার সাগরে পাড়ি দিতে চলল। চারুশীলাদি তাকে ধরে রাখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। মানুষের উপর বোধহয় তাঁর শেষ বিশ্বাসটুকুও চলে গিয়েছিল। এক গাল হাসি আর বগলে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে মিনি শ্রীমতীকে সী-অফ্ করতে স্টেশনে এল। এলামাসি-বেলামাসিরা আগেই নেমে গিয়েছিলেন, চারুশীলাদির সংসারের হিসাব-নিকাশ গোছগাছ করতে তাকে আরও দুদিন থেকে যেতে হল।

এর মধ্যে মিলিমামি এসে একদিন তাকে রিনিমাসিমার বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সবাই অনাবশ্যকভাবে বহু সান্ত্বনাবাক্য বললেন। চারুশীলাদিকে অমরেশ ড্যাম-ডেস্পট্ আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করলেন না। কিন্তু সব শেষে তাঁরাই আবার উৎসুকভাবে পূর্বোল্লিখিত নীল চিঠির সম্বন্ধে প্রশ্নাদিও করতে ছাড়লেন না। চিঠির প্রসঙ্গ শ্রীমতীর মনে এতদিনে ক্লান্তি এনে দিয়েছিল। সে সহজেই তাঁদের বলতে পারল, ও একজন মেয়ের লেখা চিঠি। তাঁরাও মনে ভেবে নিলেন—শ্রীমতী আমাদের মিথ্যা কথা বলে ফাঁকি দিল। যে শ্রীমতী জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি!

সন্ধ্যাবেলা একদিন মিনিও এসে ক্ষমাভিক্ষা করেছিল, শ্রীমতীর চাকরি ঘুচিয়ে দেবার অনিচ্ছুক কারণ তো সে নিজেই! হাতে রুপালী কাগজে মোড়া এক বাক্স চকোলেট; উদারভাবে বাক্সটা শ্রীমতীর দিকে ধরে

দিয়ে মিনি বলেছিল, "বেঁচে গেলে শ্রীমতী! কবরের দরজা খুলে দিলাম, তোমার উচিত আমাকে বকশিশ দেওয়া।"

শুভেন্দু ভালো-মন্দ কোনো কথাই বলেনি। একবার প্রশ্নও করেনি, অনুযোগও করেনি, বলেনি, "একি শ্রীমতী, তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই! একটুখানি বাধা পেয়েই অমনি রণে ভঙ্গ দিলে!"

উড়ে গেল শ্রীমতীর দুদিনের নীড়! ছোট শাদা শোবারঘরের উত্তরের জানলায় সবুজ কম্বলের পর্দা, পর্দা সরালেই দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের রেখা চোখ জুড়ে থাকত। শ্রীমতীর বুকের ভিতরে কি যেন সাড়া দেয়। মনে হয় জীবনে এসব ছোটখাট সংঘর্ষের কোনো অর্থ নেই, কোনো মূল্য নেই। শুভেন্দু যদি একবার শুধু জিগগেস করত, তবে তাকে বুঝিয়ে বলা যেত এর মধ্যে রাগ-অভিমানের কোনো কথা নেই। আমার অন্তর যে শিকল মানে না, কেমন করে থাকি? কিন্তু, হায়, শুভেন্দু একবারও জানতে চাইলে না।

ট্রেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে শুভেন্দুও স্টেশনে এসে পেঁাছল। এসেই মিনিকে বলল, "বাঃ! তুমি দেখছি দিব্যি ডিউটিফুল হয়ে উঠেছ! তুমি স্টেশনে এসেছ শুনে আমার অলস মনকে বললাম, ছি! তোমারও কি কোনো কর্তব্য নেই! তাই এলাম দেখতে! শ্রীমতী দেবী, কিছু ভয় নেই, নিশ্চিন্ত মনে দামোদর নদের তীরে চলে যান, আমরা এদিকে চাকরি-নম্বর-থ্রি খুঁজে রাখি।"

কিছু বলা হয় না, ট্রেন ছেড়ে দেয়। মুখ বাড়িয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত দেখে মিনি ও শুভেন্দু হাসিমুখে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রীমতীর জীবনে আরেক অধ্যায়ের শেষ হয়।

কলকাতায় এসে এলামাসির অনুরোধে শ্রীমতী তাঁর বাড়িতেই উঠল। পরিচিত ঘরবাড়ি, চেনা মানুষের ভিড়। কিন্তু তবু কোথায় যেন

একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে। মনের পুরাতন ভিতগুলিতেই ভাঙন ধরেছে, বুঝতে পারে। লকেট্-বকেট্‌কে সঙ্গী করে একবার রমেশ চৌধুরীর শূন্য বাড়িখানি দেখে এল। দরজা জানলা বন্ধ, সদর দরজায় তালা দেওয়া। শ্রীমতী জোর করে মন থেকে দুর্বলতাকে দূর করে দেয়। মানুষই যদি চলে গেল, বাড়ির আবার কোন আকর্ষণ? সারি-সারি বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে তবু যেন হু-হু করে ওঠে মন। দীর্ঘ কুড়ি বছরের আকর্ষণ কি সহজে ছেঁড়া যায়!

মাঝে-মাঝে মনে হয় লকেট্‌ও যেন বদলিয়ে গেছে। কচি মুখের সেই লাবণ্য আর নেই। জিগগেস করতে বাধে। কারো ব্যক্তিগত সুখ-দঃখে অনধিকার প্রবেশ করতে নেই। দিবারাত্র তাদের বন্ধুরা আসছে যাচ্ছে, তাদের কাবো সঙ্গে শ্রীমতীর চেনাশোনা হল না। বকেট্ ছাদের ঘরে পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। শ্রীমতী তবু তাকেই ডেকে নিয়ে একদিন শুভেন্দুর বাড়ি গেল, লাইব্রেরি থেকে কতগুলি বই বাছাই করে নিয়ে এল। সে বাড়িতেও চাকরবাকর ছাড়া আর কেউ নেই। তারা তো বলল শুভেন্দু দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরছে। কিন্তু শ্রীমতী হয়তো তার আগেই কর্মস্থলে চলে যাবে।

এলামাসির সংসার মেসিনের মতো চলে, ঘড়ি-ধরা সেই নিয়মকানুনের মধ্যে শ্রীমতী কোনো কাজই খুঁজে পায় না। মিস বিশ্বাসের চিঠি এলেই তাকে রওয়ানা হতে হবে। শুয়ে বসে এখন শুধু সেই চিঠির অপেক্ষা করা।

দার্জিলিঙ থেকে এতদিন পরে ফিরে এলামাসি তাঁর পর্বতপ্রমাণ সংসার-কাজের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যেবেলা একদিন শ্রীমতীকে ডেকে বললেন, "ওরে শ্রীমতী, বুড়ো না হলে বুড়ো হওয়ার দুঃখ বোঝা যায় না! জানিস, আমাকে একটু যে পরামর্শ দেবে এমন একটা লোক নেই। তোর মেশোমশাইকে তো আর ঠিক মানুষের মধ্যে গোনা যায় না। সময় মতো স্নানের জলটি, ঠিকমতো খাবারটি পেলেই

এ-সংসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হল। একা আমি এদিকে ভেবে-ভেবে মরি।"

শ্রীমতী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, "কেন মাসিমা, কি হয়েছে?"

"এই লকেট্‌কে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। এত যত্ন করে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে, সব দিক দিয়ে আর পাঁচটা মেয়ের যুগ্যি যাতে হয়। অথচ ওর জন্যই আমার যত অশান্তি।"

এলামাসি একবার শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, "কি চমৎকার ছেলে ঐ শুভেন্দু! বিয়ে হওয়া না-হওয়া যার যেখানে লেখা আছে। সে তো জানা কথা, তবু চেষ্টা তো করতে হয়। না! তাকে আমার মেয়ের পছন্দ নয়। ঐ যে অতনু বলে ছেলেটি আসে, তাকে ওর মনে ধরেছে! অথচ আমি মা হয়ে কি করে মত দিই বল্? বাপ একটা কানাকড়ি রেখে যায়নি। বিধবা মা আছে, আবার একটা ছোট বোনও আছে, বিয়ে হয়নি। থাকার মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের চাকরিটা। কত আর পায়? শ'চারেক বড় জোর! অথচ মেয়ে কিছুতেই বুঝবে না! তুই-ই বল্ না, আমি মা, আমি কি ওর সুখ-দুঃখ বেশি বুঝি না? মা-বাপের মতো হিতৈষী কে আছে বল্?"

শ্রীমতী নীরব।

এলামাসি বলে যান, "ওকে একটু বুঝিয়ে বলিস, শ্রীমতী। আমরা চিরকাল ওর ভালোটা চিন্তা করেই কাজ করি। ও সংসারের কতটুকু জানে? গরীবের ঘরে ভালোবাসাই বা টিকবে ক'দিন? ওসব চোখের ভালোবাসা। শুভেন্দুর মতো ছেলের সঙ্গে কি তুলনা হয় ওর? তুই একটু নিরিবিলি ওকে বলিস কিন্তু।"

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলল, "মাসিমা, ওর ওপর জোর করাটা কিন্তু উচিত হবে না। কুড়ি বছরের কোনো মেয়ে নিজের সুখ-দুঃখ নিজে যতখানি বুঝবে, পৃথিবীতে আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। ছেলেটিকে আপনার পছন্দ না হয়, এখন কিছু বলবেন না। লকেট্ আসছে

বছর বি. এ. পাশ করবে, তারপর বিয়ের কথা ভাববার ঢের সময় থাকবে। দেখুন না ততদিনে ওর মত বদলায় কিনা। জোর করতে গেলেই উল্টো ফল হবে।"

এলামাসি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে এই সঙ্কোচহীনা মেয়েটির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন, "কি জানি, তোর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওদিকে চারুশীলাদি তো নিজের আধবুড়ো মেয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। দার্জিলিঙে থাকতে কিছু শুনলি-টুনলি নাকি? চারুশীলাদির কথা শুনে তো মনে হত শুভেন্দু একরকম ওঁদের বাড়িতেই দিন কাটায়। এখন খালি গাঁট-ছড়াটা বাঁধলেই হল। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আরে, লোকে তো ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে ঐ মিনিটিকে শুভেন্দুর পিসিমা ঠাওরাবে। আর যায়ই বা কেন শুভেন্দু অত ঘন-ঘন ওদের বাড়ি? কি করে সেখানে? তুই তো সবই জানিস।"

শ্রীমতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এলামাসিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাকে চারুশীলাদির কথারই পুনরুক্তি করতে হয়, "মিনিদি আর শুভেন্দুবাবুর এক ধরনের ইণ্টারেস্ট কিনা, তাইতে দুজনের মধ্যে বেশ ভাব।"

এলামাসি কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "চারুশীলাদি তোকে তাই বুঝিয়েছেন বুঝি? আচ্ছা আহাম্মক তো তুই! পুরুষমানুষের জীবনে একটা বই দুটো ইণ্টারেস্ট থাকে না। তবে—হ্যাঁ—সে আর তুই জানবি কি করে!" হাঁড়িমুখ করে এলামাসি গাত্রোত্থান করলেন।

কাটল আর একটা দিন। লকেট্‌কে কিছু বলা হয় না। সন্ধ্যেবেলা যখন অতনু এল, শ্রীমতী তাকে একটু নজর করে দেখে নিল। সুশ্রী ছেলেটি, স্বল্পভাষী, গম্ভীর, শ্রীমতীর ভালো লাগল ছেলেটিকে। লকেটের জন্য দুঃখ হয়। ভালোবাসা সত্যি হলে নিশ্চয়ই তার একটা শক্তিও থাকবে। নিজের পথ সে তাহলে নিজে কেটে নেবে, সংসারে

কোনো এলামাসির সাধ্য নয় তাকে ঠেকাবে। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে শ্রীমতী ভাবে জীবনের কাছ থেকে সকলে কখনো এক জিনিস কামনা করে না। যা নইলে একজনের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়, আর একজনের কাছে তা অকিঞ্চিৎকর। প্রত্যেক মানুষের মনে-মনে নিজেব একটা মাপকাঠি থাকে, একজনেরটা দিয়ে আর একজনের চলে না। মা-বাবা কি করে বুঝবেন মেয়ে কিসে সুখী হবে?

পরদিন সকালে মিস বিশ্বাসের চিঠি এল। বেলা একটায় একটা লোকাল ট্রেন আছে, সেটা ধরাই ভালো। পরদিন রবিবাব, সব দেখে শুনে নিতে পারবে। সোমবার থেকে কাজ আরম্ভ। যেটুকু গোছগাছ বাকি ছিল শ্রীমতী নিশ্চিন্ত মনে সেটুকু সেরে নিল। ভেবেছিল একা একাই স্টেশনে চলে যাবে, শেষ মুহূর্তে ঘণ্টা দুইযের জন্য বইখাতা তুলে রেখে বকেট্ তার সঙ্গ নিল। বেশ ছেলে বকেট্। লোকের সামনে মূক ও বধির, একা থাকলেই মুখে খই ফোটে। শ্রীমতীর সঙ্গে অনর্গল বকে যেতে লাগল। অনেক আশ্বাস দিল তাকে। ভয় কি? চাকরি ভালো না-লাগলে সে যেন নিশ্চয-নিশ্চয চলে আসে। মিস বিশ্বাসকে গোড়া থেকেই জানিয়ে দেওয়া উচিত যে চালাকি-টালাকি চলবে না। বকেটের মুখেই খবর পাওয়া গেল শুভেন্দু কাল এসে পেঁাচেছে, মিনিদিও। সে উঠেছে বেলামাসির বাড়িতে। প্রতিশ্রুতি দিল, ওরা সবাই দল বেঁধে বকেটের পরীক্ষার পরই শ্রীমতীর নতুন বাড়িতে বেড়িয়ে আসবে। সকালের গাড়িতে যাবে, সন্ধ্যাব গাড়িতে ফিরবে। শ্রীমতী যেন খুন্তি কড়াই রেডি রাখে।

শ্রীমতীর মনে হল বকেটের বিদায়-সম্ভাষণে কোথাও কোনো খুঁত নেই, সৌহৃদ্য দিয়ে ভরপুর।

মাত্র ঘণ্টা তিনেকের পথ। দেখতে-দেখতেই যেন শেষ হয়ে গেল। ছোট

স্টেশনটিতে ট্রাঙ্ক সুটকেশ বিছানা নিয়ে নেমে পড়ে শ্রীমতী ইতস্তত তাকাতে লাগল। অস্পষ্ট একটু আশা হয়তো ছিল, কেউ আসবে স্টেশনে, বলবে, "আসুন! আপনি এসেছেন বলে আমরা খুশি হয়েছি।" তাকিয়ে দেখল শূন্য স্টেশন, কয়েকটা কুলি এদিকে-সেদিকে ঘুর-ঘুর করছে। তাদের কাছে শুনল স্টেশনের পিছনেই মেয়েদের স্কুল, গাড়ি লাগবে না, পাঁচ মিনিটের পথ। প্রৌঢ় স্টেশনমাস্টারও বেরিয়ে এসে নমস্কার করে জানালেন যে সকালে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস এসে নতুন টিচারের কথা বলে গেছেন। কোনো ভাবনা নেই, কুলিরা সব জানে। পুনরায় নমস্কার করে তিনি আবার তাঁর কুঠুরির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কুলিরাই শ্রীমতীকে উৎসাহ দেয়, সাগ্রহে পথ-প্রদর্শকের পদ গ্রহণ করে।

ছোট শহরের ছোট রাজপথ, ধুলায় ধুসর। দুই ধারে ঘাস জন্মিয়ে গেছে, ধুলায় ঘাসের সবুজ রঙ চেনা যায় না। পথের পাশে বাবলা গাছ, তাও ধুলায় বিবর্ণ। একটু এগিয়ে গিয়ে স্কুলে যাবার পথটি যেখানে আলাদা হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে আর ধুলো নেই, চারদিক শ্যামল সবুজ।

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া লাল ইঁটের একতলা লম্বা ইস্কুল। পিছনে আমবাগান, তার ওপাশে ছোট-ছোট বাড়ি, কুলিরা বললে টিচারদের কোয়াটার্স। আজ শনিবার, একটায় ছুটি হয়ে গিয়েছে, স্কুলবাড়িটা তালামারা। স্কুলবাড়ি ঘুরে কুলিরা আমবাগানের দিকে চলল।

কোথাও শ্রীমতী জনমানুষের সাড়া পেল না। বেলা সাড়ে-চারটের শুকনো রোদে কেউ বাইরে নেই। কুলিরা মনে হল সর্বজ্ঞ, তারা ঠিক চিনে নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসে বিছানা-বাক্স নামাল। পরিষ্কার, পরিপাটি, প্রাণহীন। গাছপালার বাহুল্য নেই, কাটাছাঁটা চারদিক। সামনে সরু বারান্দা, একটা বড় ঘর, একটা ছোট ঘর, একটা স্নানের ঘর। সব দরজা জানলা খোলা, ঘরের লাল মেঝেতে রোদ লুটিয়ে পড়েছে।

বড় ঘরে কুলিরা জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে, পয়সা গুনে নিয়ে বিদায় নিল। কিন্তু নির্বান্ধব শ্রীমতীকে একেবারে ত্যাগ করে গেল না, যাবার সময় মিস বিশ্বাসকে খবর দিয়ে গেল।

স্নানের ঘরে বালতি করে জল রাখা ছিল, শ্রীমতী হাতমুখ ধুয়ে ক্লান্তি দূর করল। প্রথমেই সদর দরজা ছাড়া আর সব দরজা বন্ধ করে নিজের চারদিকে একটা আব্রু রচনা করতে চেষ্টা করছিল। মনে করল পরে হাতুড়ি পেরেক যোগাড় করে সব দরজা জানলাতে সবুজ পর্দা-গুলি ঝুলিয়ে দেবে, দেয়ালে দু'-একখানি ছবি টানিয়ে দেবে।

আসবাবের বাহুল্য না-থাকলেও ঘরগুলি একেবারে শূন্য নয়। বড় ঘরে একটা তক্তপোশ রয়েছে, জলচৌকি আছে, আলনা আছে। সব সস্তা কাঠের তৈরি কিন্তু কুশ্রী বলা চলে না। ছোট ঘরে এমন কি ছোট একটি টেবিল, দুখানা চেয়ার, একটা ডেক-চেয়ার পর্যন্ত আছে, আর একটা দেয়াল-আলমারি।

বাক্স থেকে ছোট একটি আরশি বের করে জানলার উপর রেখে সংক্ষেপে প্রসাধন সেরে নিল শ্রীমতী। বিছানা খুলে তক্তপোশেব উপর পরিপাটি করে পেতে রাখল। কোমল সবুজ আচ্ছাদনটি—ঐটুকুতেই ঘরের শোভা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। পর্দাগুলি এই মুহূর্তে কোনো কাজে লাগবে না, তাই দুখানি সবুজ টেবিলের চাদর বের করে শ্রীমতী টেবিল আর জলচৌকিটা ঢেকে দিল।

দরজার কাছে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে অতিশয় শীর্ণকায়া এক মহিলা—যৌবন গেছে, বিরল হয়ে এসেছে মাথার চুল—এক হাতে পেয়ালা-পিরিচ, অপর হাতে ছোট একটা চা-দানি নিয়ে ইতস্তত করছেন। খুশি হয়ে তাঁকে ঘরে ডেকে আনল শ্রীমতী। অপরিচিতার জন্য মনে করে নিজের হাতে তৈরি চা এনেছেন, কৃতজ্ঞ না-হয়ে পারা যায় না।

মহিলা চেয়ারের কিনারায় সোজা হয়ে বসলেন, শুকনো খরখরে

গলায় বললেন, "বা, ঘরটির একেবারে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন যে! এ-ঘর যে এমন হতে পারে সবিতা থাকতে কে বলতে পারত!"

শ্রীমতী জিগগেস করলে, "আপনিই কি মিস বিশ্বাস?"

মহিলা জিব কেটে সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "না, না, আমি মিস বিশ্বাস নই! মিস বিশ্বাস সন্ধেবেলা আসবেন। আমার নাম সুবর্ণ অধিকারী, স্কুলের নিচের ক্লাশে বাংলা আর ইতিহাস পড়াই। আবার টিচারদের খাওয়া-দাওয়ার দেখা-শোনাও করি। সবিতা ঘোষ ছিল এখানে আর এক টিচার, তার জায়গাতেই আপনি এলেন।"

চা খেতে-খেতে মিসেস অধিকারীর মুখে অনেক কথা জানা হয়ে গেল। বোর্ডিং খোলার কথা আছে দু'বছর বাদে, তখন এ-ব্যবস্থা উঠে যাবে। সুবর্ণ দেবীকে আর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে হবে না। এখন এগারোজন টিচার স্কুলের কম্পাউণ্ডে নিজের-নিজের বাড়িতে বাস করেন, কিন্তু রান্নাবান্না হয় একসঙ্গে, মিসেস অধিকারীর বাড়ির সংলগ্ন বড় রান্নাঘরে। চাকর রয়েছে কয়েকটি, তাছাড়া তিনটে ঝি, ফাইফরমাস খাটার জন্য ছোকরা চাকর আর দরওয়ান। স্কুল কর্তৃপক্ষই তাদের ব্যয় নির্বাহ করেন। চাকররাই ঘর পরিষ্কার করে, টিউব-ওয়েল থেকে জল বয়ে এনে স্নানের ঘরে দিয়ে যায়। তবে রান্নার লোকের মাইনে আর নিজেদের খাওয়ার খরচ টিচাররাই চাঁদা করে চালিয়ে থাকেন। শ্রীমতী যেন না ঘাবড়ায়, তাকে টাকাটি গুণে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে হবে না। অবশ্য একটা জলের কুঁজো, দুখানা কাঁচের গেলাশ, পেয়ালা পিরিচ প্লেট চামচ ইত্যাদি কিছু-কিছু জিনিস এখন তাকে কিনে নিতে হবে। ও হ্যাঁ, আর একটি ঝাঁটা ও গোটা দুই ঝাড়ন। নইলে চাকরদের অসুবিধা হয়। রান্নাঘরের টিফিন-ক্যারিয়ারে করে যথাসময়ে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অন্য জিনিসপত্রগুলিও মিসেস অধিকারীকে টাকা দিলে তিনি কিনে দিতে পারেন।

শুনে শ্রীমতীর আশ্চর্য লাগে। "সবই নিজের-নিজের বাড়িতে বসেই

হয়ে যাবে? কারো সঙ্গে কারো দেখাশুনাও কি হয় না এখানে? বাড়ির জন্য মন কেমন করে না ওঁদের কারো?"

মিসেস অধিকারী উঠে পড়েন। বলেন, "বাড়ি আবার কোথায়? এই তো বাড়ি। এখনো ছেলেমানুষ আছেন বলে ও-কথা বলছেন। নিজের রোজগারের চালাঘর আর শাকভাতই সব চেয়ে ভালো। শ্রীমতীকে বুঝি বাপ-মা ভাই-বোন বাড়ি-ঘর ছেড়ে আসতে হয়েছে?"

শ্রীমতী ব্যস্ত হয়ে বলে, "না, না, আমারও এখানেই বাড়ি-ঘর হবে, আমারও নিজের মানুষ নেই, বাড়িও নেই। তবে একা-একা কি আর বাড়ি হয়, তাই বলছিলাম।"

মিসেস অধিকারী বললেন, "একা থেকে শান্তিতে থাকাই সব থেকে ভালো, আরেকটু বয়স হোক, বুঝবেন।"

সুবর্ণ অধিকারী চলে গেলে শ্রীমতী কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকে। তারপর স্নানের ঘর থেকে চায়ের সরঞ্জাম ধুয়ে দেয়াল-আলমারিতে তুলে রাখে, রাত্রে ঝি এসে নিয়ে যাবে।

বাইরের প্রখর রৌদ্র নিস্তেজ হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে শ্রীমতী দেয়ালে দু'-একটা পেরেক আবিষ্কার করে ফেলে। রঙিন ফুলের ছবি দেওয়া একটা ক্যালেণ্ডার সেখানে ঝুলিয়ে দেয়, তাকে দু-চারখানা বই সাজিয়ে রাখে। হলদে রঙের পোড়া মাটির ঘটিতে জল ভরে বাইরে থেকে আমের সবুজ পল্লব এনে সাজিয়ে রাখে। টেবিলের উপর বসিয়ে দেয় প্রিয় কালো ঘড়িটাকে। কাজ শেষ হলে ডেক-চেয়ারে বসে নিজের ঘরের শোভা নিজেই দেখে। ভাবে—বাড়ি? বাড়ি কাকে বলে? ইঁট কাঠের দেয়াল দিয়ে কি বাড়ি তৈরি হয়? তবে তো রেল-স্টেসনও বাড়ি হত। হয় না কেন?

ভাবতে চেষ্টা করে এই তো আমার বাড়ি। গর্বে বুক ফুলে উঠে, মনে মনে বলে, আমি নিজে অর্থ উপার্জন করে এই আমার বাড়িটিকে সুন্দর করে রাখব। চেয়ারে কুশন পাতব। কে বসবে? কেন, এগারোজন

টিচার আছে, তারা? আমি ছাড়া আরও দশজন। আমার দশজন বন্ধু। তারা সবাই বসবে। আজ আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, কাল সকালে সকলের সঙ্গে আলাপ করে আসব। কিন্তু তারা এল না কেন? সে নতুন এসেছে, তাকে দেখার কৌতূহলও কি নেই? হয়তো তারাও ক্লান্ত, বেলা একটা অবধি স্কুল পড়িয়ে ক্লান্ত।

এমনি করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সন্ধ্যায় মিস বিশ্বাস এলেন, বারান্দা থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকলেন, "মিস চৌধুরী! আসব ভিতরে?" মেমেদের মতো গলা, মেমরা বাংলা বললে যেমন শোনায়। "একি অন্ধকার কেন? মন খারাপ করছেন বুঝি? আমরা হলাম কাজের মানুষ, মন খারাপের আমাদের সময় কোথায়? উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন!"

বসে-বসে শ্রীমতীর তন্দ্রা আসছিল, সচকিত হয়ে উঠে সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দিল, অপ্রতিভভাবে মিস বিশ্বাসকে অভিবাদন করে বসাল। দোহারা ফর্সা মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে, সুবেশা, সচতুরা, আধুনিকা। কানে মুক্তোর টপ, গলায় সোনার ক্রস ঝুলছে, হাত ঘড়ি, হ্যাণ্ড ব্যাগ, টর্চ।

মিস বিশ্বাস বেলামাসিদের কুশল প্রশ্ন করেন। সহপাঠিনী তাঁরা, পুরোনো বন্ধু। বন্ধুর কথায় গলা একটু কোমল হয়ে আসে।

"আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো মিস চৌধুরী? অসুবিধা হলেই আমাকে বলবেন। সুবর্ণ এসে চা দিয়ে গেছে? এখানকার সব বন্দোবস্ত শুনলেন তো? সুবর্ণ বেশ ভালোই চালায়, ভারি সুগৃহিনী, তবে কিনা টাকা-পয়সা বেশি ওর হাতে না-দেওয়াই ভালো। কিন্তু ওর সঙ্গে সবাই আমরা ভালো ব্যবহারই করে থাকি, জীবনে বেচারী দুঃখও পেয়েছে অনেক। স্বামী নেয় না, ছেলেপুলে নেই। ফলে মেজাজটা কি রকম তিতিয়ে গেছে। ওর কথা শুনে আবার মন-টন খারাপ করবেন না যেন।"

ঘর সাজানো দেখে মিস বিশ্বাস খুব খুশি। বলেন, "এসব কাজের চেয়ে বিয়ে-থা করে আরামে থাকলেই আপনার ভালো হত না কি? দিব্যি আরেকজনের উপার্জন দিয়ে নির্বিবাদে জীবনটা কাটাতে পারতেন।"

শ্রীমতী প্রবল আপত্তি জানায়। তার কাজকর্মের কথা জিগগেস করে। মিস বিশ্বাস সব বুঝিয়ে বলেন, কাজ তেমন বেশি না, আবার নেহাত কম বললেও ভুল হবে। উপরের ক্লাশে তাকে অঙ্ক শেখাতে হবে আর সেই সঙ্গে বাংলা পড়াতে হবে। প্রতিটি কথা সে মন দিয়ে শোনে, কিছুতেই কাজের ত্রুটি ঘটতে দেবে না।

রাত হয়ে আসে, মিস বিশ্বাস বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। জানিয়ে গেলেন জায়গাটা নির্জন হলেও নিতান্ত মরুভূমি নয়। দামোদরের তীরভূমি ভারি সুন্দর। শহরে কয়েকজন অতিশয় সজ্জন বাসিন্দাও আছেন। মহিলা সমিতি, লাইব্রেরী, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, সবই আছে। শ্রীমতীকেও সে-সব কিছুর ভাগ নিতে হবে।

শ্রীমতীর ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। দাদাবাবু এত কাজের কথা শুনলে কত না খুশি হতেন।

মিস বিশ্বাস চলে গেলে অনেকক্ষণ তেমনি বসে রইল শ্রীমতী। দাদাবাবু কোথায় গেলেন? দেহের সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়? কোথাও তিনি নেই? যদি কোথাও থাকেন তবু কেমন করে শ্রীমতীকে তিনি স্মরণ করবেন। তাঁর কাছেই সে শিখেছে স্মৃতির আধার হল মানুষের মস্তিষ্ক। সে তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর শ্রীমতীকে তিনি স্মরণ করবেন কি দিয়ে?

ঝি এসে টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার, সঙ্গে নতুন সব বাসনপত্র দিয়ে গেল। চাকর এসে কুঁজো ভরে জল দিয়ে গেল।

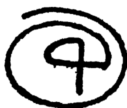
জীবনে এই প্রথম একাকিনী এক বাড়িতে তাকে রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে।

পরদিন রবিবার। ঘুম ভেঙে চোখ মেলেই শ্রীমতীর মনে পড়ে সে একা। জনহীন কোনো দ্বীপে বাস করতে এসেছে। কোথায় যেন পড়েছিল, মানুষের হৃদয়ের চতুর্দিকে নীল জলরাশি বেষ্টন করে আছে। সবাই আমরা সেই জলে ঘেরা দ্বীপ। কখনো দক্ষিণ বাতাসে আর এক দ্বীপের খবর যদি এসে পেঁছয় সে বড় সৌভাগ্য।

শ্রীমতী উঠে পড়ে আগের দিনের তোলা ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে নেয়। সময়মতো চা-টোস্ট এসে পেঁছয়।

ক্রমে সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। মিস বিশ্বাস সঙ্গে করে তাকে সেক্রেটারির বাড়িতেও নিয়ে গেলেন। স্থানীয় কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরের শিক্ষিতা পত্নী। অতিথি-সৎকারে তিনি সুদক্ষা। শ্রীমতীকে আদর করে বসালেন, উপদেশ বর্ষণও করলেন কিছু-কিছু। এখানে নাকি দু-একজন ছাড়া কোনো টিচার বেশিদিন থাকে না। ছোট শহরে মন বসে না হয়তো। আমোদ-প্রমোদের হয়তো ঘাটতি এখানে। কাজে অনুরাগ আসলে ক'জনেরই বা থাকে! শ্রীমতী মনে-মনে সংকল্প করল : আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করব।

দুপুরে আহারান্তে শ্রীমতী এলামাসি বেলামাসিকে চিঠি লিখতে বসে। কোথাও কোনো ত্রুটি রাখতে ভালো লাগে না, তাই চারুশীলাদিকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট একখানি পত্র লিখতে হল। তারপর বহুক্ষণ কলম ধরে নিশ্চলভাবে বসে থেকে অনেক কষ্টে আরেকখানা চিঠিও সে লিখে ফেলল। ভাষা খুঁজে পায় না, মনের কথাটা গুছিয়ে বলতে হিমশিম লাগে। অপরিচিতা মাকে কেমন করে চিঠি লিখতে হয় জানে না। মা বলে ডাকতে সংকোচ লাগে, সম্বোধন লেখে কেবল 'শ্রীচরণেষু' ভাবে 'তুমি' লিখবে না 'আপনি' লিখবে? 'তুমি' বলাই ভালো। লেখে, 'তুমি শুনে সুখী হবে আমি বাস্তবিক আশ্রয়হীনা নই। আমার চাকরি আছে, থাকবার বাড়ি আছে। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। তুমি যেতে বলেছিলে বলে হৃদয় আমার কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গেছে।'



যা ছিল নতুন, দু'দিন পরে সেই হয়ে দাঁড়াল পুরোনো। শ্রীমতী ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে নেয়। ছোট বাড়িখানিকে গুছিয়ে রেখে, মিস বিশ্বাসের পরামর্শ অনুসারে দরজায় তালা লাগায়। তারপর সাড়ে-দশটার সময় স্কুলের বড় হলঘরে গিয়ে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে একত্র সার বেঁধে দাঁড়ায়। সামনে সারি-সারি দাঁড়িয়ে মেয়েরা। পরিপাটি করে বেণী-বাঁধা চুল, পিন দিয়ে আঁটা শাদা শাড়ি—নইলে মিস বিশ্বাস অসন্তুষ্ট হবেন। তেল চকচকে মুখ, নির্বিকার ভাবলেশহীন জোড়া-জোড়া চোখ, শাসাসিধে বাঙালী ঘরের মেয়ে। সরল মন কৌতূহলে ভরা।

সেই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ কোনো এক নৈর্ব্যক্তিক ভগবানকে উদ্দেশ্য করে, অতি দ্রুত উচ্চারণে গুটি কতক নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনা তাদের জানাতে হয়। অটুট উৎসাহ মিস বিশ্বাসের। স্বয়ং ভগবানকে ধরে-বেঁধে, গড়ে-পিটে, সকল ধর্মের ও সকল মতের পক্ষে গ্রহণীয় করতে পেরে প্রার্থনার সময় তাঁর মুখে একটা গভীর প্রশান্তি বিরাজ করে। প্রার্থনার শেষ কথা ক'টি উচ্চারণ করেই, তিনি পাশের টেবিলে রাখা ছোট ঘণ্টাটি টিপে দেন, একই নিশ্বাসে বিশুদ্ধ ইংরিজিতে মেয়েদের ক্লাশে যেতে আদেশ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলের কাজ শুরু হয়ে যায়।

শ্রীমতী মনে-মনে মিস বিশ্বাসের কর্তব্যপরায়ণতাকে শ্রদ্ধা করত,

ভাবত কুড়ি বছরেও আমি অমনটি হব না। এমন কোনো সমস্যার কথাই সে কল্পনা করতে পারে না যার কাছে মিস বিশ্বাস পরাস্ত হবেন।

মেয়েরা শ্রীমতীকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার চুল বাঁধা, তার কাপড় পরা, তার কথা বলার ধরন মেয়েরা সবাই অনুকরণ করত। রোজ তাকে গোলাপ কি গন্ধরাজ ফুল উপহার এনে দিত—সেগুলির বৃন্ত এত ছোট যে ফুলদানিতে রাখা যেত না, কিন্তু শ্রীমতী সে-কথা উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ করত। মেয়েরা শ্রীমতীর ক্লাশে মনোযোগ দিয়ে তার পড়ানো শোনে, বিদ্যায় অনুরাগ ছিল বলে নয়, শ্রীমতীকে ভালো লেগেছিল বলে।

অন্যান্য টিচারদের সঙ্গে তার দু'দণ্ডের দেখাশোনা হত কি হত না। দিনের পর দিন সে একা ঘরে খায়, একাকী বাস করে। টিচাররা প্রায় সবাই তার বয়োজ্যেষ্ঠা, শ্রীমতীকে একটু সন্দেহের চোখে দেখা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মিস বিশ্বাস মাঝে-মাঝে কোমল স্বরে তাকে সতর্ক করে দিতেন—"দেখবেন মিস চৌধুরী, মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা করবেন না, তাতে ডিসিপ্লিন থাকে না। হাসি গল্পের অত প্রশ্রয় দেবেন না যেন, ওতে মোরাল খারাপ হয়ে যায়। শেষটা আর মানবে না দেখবেন।" একদিন বললেন, "মেয়েরা অত ফুল দেয় কেন আপনাকে? বারণ করে দেবেন, অন্য টিচারদের মনে একটা বিদ্বেষ জন্মাতে পারে। ওদের বাড়ি-টাড়ি না গেলেই ভালো। ওরা হল স্মল্-টাউনের মেয়ে, ওদের হালচালই আলাদা, আমাদের মতো যারা করে খাই, আমাদের ওরা কখনো বেশি শ্রদ্ধা করে না। অন্তত ওদের বাড়ির লোকেরা করে না। বহুদিন টিচারি করে এটুকু শিখেছি। লেখাপড়ার জন্য ওরা সত্যি কেয়ার করে না কিছু। তবে বিয়ের জন্য দরকার হয় খানিকটা, তাই স্কুলে আসে। সতর্ক হয়ে চলবেন। নিজের মান নিজের হাতে, মনে রাখবেন।"

সতর্ক হয়ে চলবে শ্রীমতী? সকালে উঠে জানলা খুলে পর্দা সরিয়ে নীল আকাশে সূর্যের আলো দেখলে শ্রীমতীর প্রাণ এখনো নেচে ওঠে। এখনো তার রোমাঞ্চ হয় নিমের শাদা ফুল ঘরে উড়ে এলে। শালিখের ডাক শুনতে-শুনতে উদাস হয়ে যায়। সতর্ক হওয়া কি তার পক্ষে সহজ?

স্কুলের শেষে বিকেলে এক-একদিন হাতমুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে, পরিষ্কার একখানি শাড়ি পরে শ্রীমতী ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। মিস পাল আর মিস নাগও তাঁদের বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরোন, পথে সাক্ষাৎ হয় তিনজনের। হয়তো সাহস করে নদীর দিকেও বেড়াতে যান কোনোদিন। নদী পর্যন্ত যান না, যদি দুষ্ট লোক কিছু বলে। বলা কিছু আশ্চর্যও নয়! গেল বছরের আগের বছর কে একটা বাজে লোক স্বয়ং মিস বিশ্বাসের পেছু নিয়েছিল! লোকটার সাহস ভেবে শ্রীমতীর অবাক লাগে। যদি মিস বিশ্বাস কিছু বলতেন তাকে, যদি খুব বকতেন?

মিস নাগ আর মিস পাল চোখ কপালে তুলে বলেন, "কক্ষনো কথা বলতে নেই রাস্তার লোকের সঙ্গে। কোন সুযোগে কি করবে তার কি ঠিক আছে? কখনো একা বেরোবেন না, জানেন তো সাবধানের মার নেই।"

ফেবার পথে দরজাব কাছ থেকেই তাঁরা বিদায় নেন, শ্রীমতীর শত অনুরোধেও ভিতরে এসে বসেন না। না, রাত হয়ে গেছে, সাড়ে-ছ'টা বেজে গেছে, কাজকর্ম আছে। আলো জেবলে, সবুজ পর্দায় ঘেরা স্নিগ্ধ ছায়াময় ঘরখানিতে শ্রীমতী একা-একা বসে থাকে। মেয়েদের টাস্কের খাতাগুলি দেখে রাখে, পরিপাটি করে লাল-নীল পেনসিল দিয়ে কাটাকুটি করে, তখুনি আবার একটু মায়া লাগে, বেশি করে নম্বর দিয়ে দেয়।

যথাসময়ে টিফিন-ক্যারিয়ারে ভরে রান্নাঘর থেকে খাবার আসে,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভালো রান্না। ভালোই লাগে শ্রীমতীর। ভালো লাগবার আশ্চর্য ক্ষমতা তার।

কাজকর্ম সেরে, খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে শ্রীমতী নিজের ছোট বারান্দাটিতে চেয়ার টেনে বসে। মাঝে-মাঝে রান্নাঘরের ঝি-চাকরেরা কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে তাকে দেখে একটু দাঁড়ায়, দুটো কথা বলে যায়! শ্রীমতী ভাবে আমার যদি সমবয়সী কেউ থাকত, এখানে বসে আমার সঙ্গে সে কথা বলত। মিস সেন প্রায় তার সমবয়সী, কিন্তু কেন যেন শ্রীমতীকে তাঁর ভালো লাগে না। কখনো শ্রীমতীর বাড়িতে আসেন না তিনি। শ্রীমতী ভাবে একদিন নিজেই তাঁর বাড়ি গেলে কেমন হয়?

খুশি হয়ে শ্রীমতী শুয়ে পড়ে।

পরদিন কিন্তু প্রার্থনার আগে মিস সেন আর কিছুতেই শ্রীমতীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। চিঠির তাড়া হাতে করে মিস বিশ্বাস প্রবেশ করলেন একটু পরেই। অপঠিত চিঠির একটা মনোরম শিহরণ আছে, জীবনে সে এই প্রথম অনুভব করল।

"এই নিন মিস সেন আপনার চিঠি, মিস পাল, মিসেস অধিকারী, মিসেস মুখার্জি এইসব আপনাদের পোস্টকার্ড। মিস চৌধুরী, আপনার যে একেবারে এক সঙ্গে তিনখানি চিঠি। লাকি গার্ল!"

চিঠি নিয়ে শ্রীমতী মিস সেনের কাছ ঘেঁষে যায়, তিনি সরে দাঁড়ান। সময় নেই, যে-যার ক্লাশে চলে যান, বন্ধুত্ব পাতানো আর হয় না। অবসর সময়ে ফাঁক পেয়ে শ্রীমতী চিঠি খুলল। লকেট্ লিখেছে, "আমরা ছ'সাতজন রবিবারে তোমার অতিথি হব, শ্রীমতীদি। আমার ভারি মন খারাপ। ইতি।"

দ্বিতীয় চিঠি লিখেছেন স্কুলের সেক্রেটারি : "প্রিয় মিস চৌধুরী, আগামী শনিবার আপনি আমাদের সঙ্গে চা খেলে সুখী হব। আমার মেয়েরও একান্ত ইচ্ছা আপনি আসেন..." ইত্যাদি।

হাতের লেখা থেকেই চিনতে পারে শেষ চিঠিখানি কার। "কল্যাণীয়াসু, তোমার প্রতি আমার কোনো কর্তব্য নেই, সে-কথা মেনে নিলাম। আমার প্রতিও তোমার কি কোনো কর্তব্য নেই? আমার এখন প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হল, মাঝে-মাঝে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করি, স্বাস্থ্যও খুব ভালো নয়। তুমি আমার একমাত্র নিকট আত্মীয়া, তোমার সঙ্গ চাওয়া কি আমার পক্ষে অস্বাভাবিক? তোমার জীবন তুমি গুছিয়ে নিয়েছ, তুমি সুখী হও আশীর্বাদ করি। কিন্তু আগামী গ্রীষ্মের ছুটিটা যদি আমার কাছে কাটিয়ে যাও, তোমার মাকে তুমি কত সুখী করবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। ইতি—"

কোথায় যেন ব্যথা বাজে। শ্রীমতীর চোখের দৃষ্টি এমন করে ঝাপসা হয়ে আসে কেন? একবার সে কাছে গেলেই যে খুশি হয়, কেমন করে শ্রীমতী তাকে প্রত্যাখ্যান করবে? এই পৃথিবীতে দাদাবাবু ছাড়া কাকে সে সুখী করেছে? দাদাবাবুরও চলে যেত তাকে ছাড়া, তাকে তাঁর সত্যিকারের প্রয়োজন তো ছিল না! কিন্তু শ্রীমতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দাদাবাবুর চিত্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে যেত। এখন আর কে খুশি হয়? দাদাবাবু বলতেন, "মরে গেলে একেবারে শেষ হয়ে যায় রে। আরেকটা জীবন আছে সেখানে এখানকার সব ফাঁকি-ফাঁকা ভরে যায় একথা বিশ্বাস করিস না। ওসব উইশ্‌ফুল্‌ থিঙ্কিং। কিছু নেই, কিছু নেই, চোখ বুজলেই সব শেষ।" কেউ যদি বলে তুমি এস, তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়ালেও আমার আনন্দ, শ্রীমতী তাহলে কি বলবে? তার সমস্ত অন্তরাত্মা তখুনি যে পরাজয় স্বীকার করে বসে!

লকেট্‌কে তৎক্ষণাৎ লিখে দিল, নিশ্চয় আসবে, একদিন কেন, যতবার খুশি। সকালের ট্রেনে এস, দুপুরে দামোদরের স্রোতে স্নান করতে পারবে, আমি মিস বিশ্বাসকে বলেছি, তোমাদের জন্য রাজভোগ তৈরি করে রাখব। সারাদিন থেকে বিকেলে চা খেয়ে, ছ'টার ট্রেনে তোমরা

কলকাতা ফিরে যেও। মিস বিশ্বাস লিখতে বলেছেন এলামাসিও যেন নিশ্চয় আসেন।

সেক্রেটারিকেও সহজ উত্তর পাঠানো হল, একদিন পরে, মিস বিশ্বাসের অনুমতি নিয়ে। মিস বিশ্বাসের উৎসাহ যেন টগবগ করে ফুটে ওঠে : "সেক্রেটারির বাড়ি যাবেন বৈকি। ওটা হল একটা প্রিভিলেজ। বুঝলেন মিস চৌধুরী, কতগুলি ডিউটি আর কতকগুলি প্রিভিলেজ এই নিয়েই জীবন আমাদের।" এমন সারগর্ভ উপদেশ দান করে মিস বিশ্বাসের মন খুশি হয়ে যায়। তবে যাবার সময়ে মিস চৌধুরী যেন দরওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যান। কখনো কোথাও একা যেতে নেই।

তৃতীয় চিঠির উত্তর দেওয়াই কঠিন। কত কথার ভিড়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, কিন্তু লিখতে গিয়ে কলম সরে না। শেষ পর্যন্ত সে ছোট একটি স্বীকৃতি শুধু জানাল : শ্রীচরণেষু, গ্রীষ্মের ছুটিতে তোমার কাছে যাব।

মা'র কাছে যাব, আমি মা'র কাছে যাব। এত উত্তেজনা কোনোদিন সে বোধ করেনি। কলম হাতে দেয়ালের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে বহুক্ষণ সে বসে রইল।

শনিবার বিকেল। সাড়ে-চারটার সময়ে ফিকে নীল সুতির শাড়ি পরে, দরওয়ান সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী ধুলোভরা পথ ভেঙে, সেক্রেটারির বাড়িতে গেল। সেক্রেটারি মহাশয়া স্বামী আর কন্যাকে নিয়ে গাড়িবারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলেন, অভিবাদন করে ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরের দেয়ালে সারি-সারি বিলিতী ছবি টাঙানো, কোণে-কোণে পিতলের পাত্রে লতাগুল্ম। নীল গদি-মোড়া চেয়ারে বসে, মিহি সুশ্রী পেয়ালাতে চা পান করতে-করতে চারুশীলা-মাসিমার কথা মনে পড়ে। চারুশীলা-মাসিমা কিন্তু তার চিঠির উত্তর দেননি।

সেক্রেটারি মহাশয়ার স্বামী কেকস্ট্যান্ড কাছে টেনে নিয়ে গদি দেওয়া নিচু মোড়াতে বসলেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই শ্রীমতীকে স্কুল এবং স্কুল পরিচালনা সম্বন্ধে শত-শত প্রশ্ন করলেন। তার সারমর্ম এই যে শ্রীমতী ছেলেমানুষ, সে উপলব্ধি না করলেও, মিস বিশ্বাস সুবিধার লোক নন। হেডমিসট্রেস হওয়া কি সোজা কথা? তার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চাই, শুধু ইংরিজি বুলি দিয়ে সেটা হয় না। তা ছাড়া হেডমিসট্রেস হতে হলে পাঁচজনের পরামর্শ নিয়ে সেই মতো তিনি কাজ করবেন, সব সময় কেবল নিজের বিচার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে থাকাটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রীমতীর কি মনে হয়?

কি আর মনে হবে তার! সে আশ্চর্য হয়ে শোনে। বারবার মিস বিশ্বাসের কর্মকুশলতার প্রশংসা করতে চেষ্টা করে। তাঁরা সেদিকে দৃকপাত করেন না। কথায়-কথায় অনেক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ জানতে চান শ্রীমতীর কাছে। মিস বিশ্বাসের সঙ্গে কোথায় তার পরিচয়? কে তার অভিভাবক? রমেশ চৌধুরীর নাম শুনে কিছুটা তাঁরা প্রসন্ন হলেন। রমেশ চৌধুরীকে কে না জানে? শ্রীমতীর মনের ব্যাকগ্রাউন্ডে তার সুশ্রী, সঙ্গীহীনা মা বুঝি মুখ টিপে হাসলেন।

অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীমতী ফিরে এল। আলো জ্বালাল না, বাইরে বসল না, ইচ্ছা করল না বই পড়ে কি খাতা দেখে। অনেকক্ষণ চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল। উঠল সেই চাকর যখন খাবার নিয়ে এল তখন। আলো জেবলে, হাতমুখে জল দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। তারপর পিক্‌উইক্ পেপার্স নিয়ে খানিকক্ষণ পড়ার চেষ্টা করে অধিক রাত্রে অবশেষে ঘুমাতে গেল। কাল ওরা ছ'সাতজন আসবে। ভুলে গেলে চলবে না।

স্টেশন থেকে মিস বিশ্বাস আর শ্রীমতী দুজনে অতিথিদের নিয়ে এলেন। এলামাসি, বেলামাসি, লকেট্, বকেট্—পরীক্ষার বেড়ি থেকে তার পা খসে গেছে—অতুল, মিনি আর শুভেন্দু।

মিস বিশ্বাস প্রথমে তাদের নিয়ে গেলেন নিজের সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত বসবার ঘরে, বসিয়ে চা আর গরম নিমকি খাওয়ালেন। তারপর স্কুল, স্কুলের বাগান, বাগানের পাশে টিচারদের ছোট-ছোট বাড়ি একে-একে সব দেখানো শেষ হলে অবশেষে অতিথিরা শ্রীমতীর বাড়ি পৌঁছলেন। দুপুরে শ্রীমতীর বারান্দায় নিমগাছের ছায়া পড়ে, নিমফুলে ছেয়ে থাকে বারান্দাটি। সেখানে সবুজ গালচে পেতে দিল শ্রীমতী। বসবার ঘরে ফুল সাজিয়ে রেখেছিল অতিথিদের জন্য। এলামাসি বেলামাসির বসা হয় না, মিস বিশ্বাস তাঁদের ধরে নিয়ে যান। বাকিরা শ্রীমতীর কুশলপ্রশ্ন করে, কি-কাজ, কেমন কাজ, সেক্রেটারি খুব রূপসী কিনা, মিস বিশ্বাস কি বিষম অত্যাচারী? শ্রীমতী হাসিমুখে উত্তর যোগায়। মিনি শুনে বলে, "গ্রেশাস, শ্রীমতী! আউট্ অফ্ দি ফ্রাইংপ্যান্ ইন্টু দি ফায়ার! মা'র চেয়ে মিস বিশ্বাস কোন দিক দিয়ে ভালো বল্ দিকিনি?"

এতক্ষণ পরে শুভেন্দু ঠোঁট খুলল, "অন্তত শ্রীমতীদেবীর চিঠিপত্র-গুলি নিরাপদ আছে তো?"

দার্জিলিঙের সেই নীল চিঠির কথা কেউ ভুলতে পারেনি। লকেট্, বকেট্, অতুল সবাই জানতে চায় সেই নীল চিঠির রহস্য। পুতুল মামার বাড়ি গেছে, সেখানে কে এক সুপাত্র আছে। মামী অতিশয় চতুরা, হয়তো শিগগিরই বিয়ের বাদ্যি বাজবে। মিনিদির খবরের কাগজের চাকরিটি নেই। একমাসের ছুটি নিয়ে, তিন মাস সে আপিস যায় না। একি মামাবাড়ির চাকরি যে থাকবে!

শ্রীমতী তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে মিনিদির কি আশ্চর্য রূপ! যৌবন যাই-যাই করেও যেন যেতে পারছে না। অনিন্দ্য তার গৌরকান্তি। নিমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মুখে আলো এসে পড়েছে, কোমল দেখাচ্ছে মুখখানি। গোপনে একবার শুভেন্দুকেও সে দেখে নিল। নবঘনশ্যাম শোভন। কোথাও দুর্বলতার লেশ নেই। কিন্তু শুভেন্দুর

চোখে এখনো সেই কৌতুকের ছায়া। শ্রীমতীর বাড়ি-ঘর কাজ-কর্ম দেখে শুভেন্দু কৌতুক বোধ করছে!

মিস বিশ্বাসের প্রস্তাব মতো, নদীর ধারে আজ চড়িভাতির আয়োজন হয়েছিল। রান্নাঘর থেকে রেঁধেবেড়ে নিয়ে, নদীর তীরে পিকনিক। সবাই খুশি।

দেখতে-দেখতে দিন কেটে যায়। ক্লান্ত হয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরে, হাত-মুখ ধুয়ে, চা খেয়েই স্টেশনে যেতে হয়। চারদিকে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কলকাকলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিচু প্ল্যাটফর্ম জেগে উঠল যেন। ট্রেনের সময় হয়ে গেল। ওরই মধ্যে এক ফাঁকে শুভেন্দু শ্রীমতীকে শান্তকণ্ঠে জিগগেস করে, "যা খুঁজছিলে, পেয়েছ এখানে?"

শ্রীমতী নীরবে মাথা নাড়ে, আর কোনো কথা হয় না। কলকাতার দল হাসিমুখে রুমাল নেড়ে চলে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে টের পায় কি ক্লান্ত সে হয়েছে। মিস বিশ্বাস জিগগেস করলেন, "ঐ যে বেলার ননদের মেয়ে মিনি, ও কি ঐ শুভেন্দুর সঙ্গে এনগেজড্?"

শ্রীমতী নীরবে মাথা নেড়ে শুধু অস্বীকার করতে পারল। আড়চোখে মিস বিশ্বাস একবার শ্রীমতীর মুখখানি দেখে নিয়ে বললেন, "মেয়ে তো নয়, বাঘিনী। ওরা সবাইকে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।"

শ্রীমতী তথাপি নীরব।

মিস বিশ্বাস আরেকবার আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "একটু ফাইট্ করবেন না? ঐ শুভেন্দুকে দেখে মনে হয় সত্যি ওর জন্য ফাইট্ করা যেতে পারে। আমার বয়েসটা যদি পঁচিশ বছর কম হত তবে দেখতেন!"

মিস বিশ্বাসের হাসির প্রতিধ্বনি করে শ্রীমতী বলে, "মিনিদির এমন রূপ, ও কিন্তু আপনাকে হারিয়ে দিত!"

স্নেহমাখা স্বরে মিস বিশ্বাস বললেন, "আজ আর পড়াশুনো করবেন

না, মিস চৌধুরী, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন।" শ্রীমতীর বুকখানা কানায়-কানায় ভরে গেল যেন।

পৌঁছে দিয়ে মিস বিশ্বাস চলে গেলেন। এলোমেলো অসংলগ্ন চিন্তা-গুলি শ্রীমতী গুছিয়ে নিতে বসে। সারাদিন এত হৈচৈ, তবু কোথায় একটা শূন্যতা থেকে গেছে।

কিন্তু এখন এ-সময় অসহিষ্ণুভাবে কে দরজার কড়া নাড়ে!

খিল খুলতেই বিস্রস্ত বেশবাস উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। ভয়ার্ত-গলায় জিগগেস করল, "সবিতাদি কোথায়?"

শ্রীমতী বসতে দিল মেয়েটিকে, শান্তভাবে বলল, "তিনি তো এখানে নেই, আমি তাঁর জায়গাতে নতুন এসেছি। তুমি কে?"

মেয়েটি বিমূঢ়ের মতো শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, "আমি সীতা। আমার কথা কেউ আপনাকে বলেনি? আমি পাশের বাড়িতে থাকি। আমার স্বামী এখানকার মস্ত জমিদার। কেউ বলেনি আপনাকে? আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না। পাড়ার লোকে আমাকে নিয়ে পরিহাস করে। আমার জা-রা, ননদরা আমাকে দেখে দুঃখ করে।"

মেয়েটি চুপ করল। শ্রীমতী বললে, "তুমি চলে যাও না কেন?"

"আমি তো কাজ করতে জানি না। চোদ্দ বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। একটু লিখতে পড়তে জানি, আর একটু রান্নাবান্না। সবিতাদি বলেছিলেন আমাকে কাজ শিখিয়ে দেবেন।" চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে ভীতকণ্ঠে বললে, "আমি যাই। মিসেস অধিকারী আসছেন।" কথা শেষ না হতে-হতে মেয়েটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মিসেস অধিকারী ঘরে এসে বললেন, "আপনার এ মাসের টাকাটা নিতে এলাম মিস চৌধুরী। আচ্ছা, ও কে বেরিয়ে গেল, জমিদার-বাড়ির বৌটি, না? একটু সাবধানে থাকবেন মিস চৌধুরী। ওদের পরিবারে নানান গোলমাল, ও বৌয়ের মাথারও ঠিক নেই, ওসবে নাক না-ঢোকানোই ভালো।"

শ্রীমতী বললে, “ওর মনে যদি কোনো দুঃখ থাকে সেটা কি দূর করতেও চেষ্টা করব না?”

“দুঃখ প্রত্যেকের মনেই থাকে মিস চৌধুরী, পৃথিবীতে কারো সাধ্য নেই সেসব দূর করবার।”

টাকা নিয়ে মিসেস অধিকারী চলে গেলেন। খোলা দরজা দিয়ে আমবাগানের পিছনে জমিদার-বাড়ির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল শ্রীমতী।

একটানা সারাদিনের হৈ-চৈ গেছে তার মধ্যেই একটুখানি আড়াল পেয়ে লকেট্ বলেছিল, “আমার কিছু ভালো লাগে না, শ্রীমতীদি। অতনু সম্বন্ধে মা এত আনরিজ্‌নেবল্ যে চুপ করে আর সহ্য করা যায় না। তার এ-বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেছে, জানো? আমার সঙ্গে পথে-ঘাটে আড়ালে দেখা হয়। বকেট্ ওদের বাড়ি গিয়ে খবর আনে। মা জানতে পারলে মেরে ফেলবেন। কি করব বল তো?”

লকেট্ তার প্রায় সমবয়সী। মায়া হয় ওর কথা শুনে। বিজ্ঞের মতো বলে শ্রীমতী, “আমি যদি সত্যি কাউকে ভালোবাসতাম, আর অন্য কোনো আপত্তির কারণ যদি না-থাকত, অমন একশো মা আমাকে বেঁধে রাখতে পারত না। কেন হতাশ হও লকেট্? পড়াশুনো শেষ কর, একুশ বছর বয়স হোক, তখনো যদি অতনুকে এইরকম ভালোবাস তোমার মা তোমাদের কি করতে পারবেন?”

“মা বলেন আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।”

“বড় কিছু লাভ করতে চাইলে তার জন্য বড় ত্যাগও স্বীকার করতে হবে ভাই!”

লকেট্ কেঁদে ফেলল, বলল, “আমি যে শক্ত হতে পারি না, শ্রীমতীদি।”

বসে-বসে শ্রীমতী ভাবে আমার এসব পরামর্শে না-জানি কত অশান্তির সূচনা হবে। সে অশান্তি আমাকে সইতে হবে না, সইবে আরেকজন। শুভেন্দু থাকলে কি পরামর্শ দিত?

রাত গভীর হয়ে আসে। শ্রীমতী উঠে শুতে যায়।

এমনি করে দিনের পর দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাস কাটে। তারপর একদিন গ্রীষ্মের অবকাশও কাছে এগিয়ে এল। গভীব রাত্রি না হলে শ্রীমতীর একটু চিন্তা করবারও অবসর মেলে না। কিন্তু বিছানায় শুয়ে যেই বন্ধ করল চোখের পাতা অমনি রাশি-রাশি চিন্তা এসে মাথার মধ্যে বাসা বাঁধল।

পরশু স্কুল বন্ধ হয়েছে। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে টিচাররা যে যার বাড়ি চলে গেছেন। বাড়ি নেই বলে যাঁরা শ্রীমতীর কাছে গর্ব করতেন তাঁরাও একটা কোনো আশ্রয় খুঁজে নিয়ে বিদায় নিলেন। মিস বিশ্বাস গেলেন পরদিন সকালে। স্কুল, স্কুলের বাগান, চাকরদের ঘর, রান্নাঘর, টিচারদের ঘরদোর পরিদর্শন শেষ করে তাঁর ভাইয়ের বাড়ি চলে গেলেন তিনি। শ্রীমতী তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। শ্রীমতী কোথায় যাবে, কবে যাবে অনেকবার তিনি জিগগেস করেছেন। অবশেষে সে তাঁকে সংক্ষেপে বলেছে, "কলকাতায় যাব, কাল দুপুরের গাড়িতে।"

ট্রেন ছাড়বার পূর্বমুহূর্তে সহসা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মিস বিশ্বাস তাকে ছোট একটি চুমো খেলেন। শ্রীমতীর চিত্ত কোমলতায় পূর্ণ হয়ে গেল। মুহূর্তে একবার মনে হল মিস বিশ্বাসকে মনের কথাগুলি বলবে, এমন কি তার মায়ের কথাও। কিন্তু সে মুহূর্তটি চলে গেল, বলা হল না।

ঘর গুছিয়ে রেখে দরজা জানলা বন্ধ করে পরদিন সে কলকাতা রওনা হল। চাবি দিয়ে এল মিসেস অধিকারীর কাছে। মিসেস অধিকারীর

যাবার জায়গা নেই, ছুটিটা তাঁর চাঁপাডাঙাতেই কাটবে। তাঁর সমবয়সী ভাইঝি নলিনী সকালে এসেছে দু-তিনটি ছেলেপুলে নিয়ে, ছুটিটা পিসীর কাছে থেকে যাবে। মিসেস অধিকারী দরজা অবধি সঙ্গে এলেন, বিদায়কালে বলে দিলেন কলকাতা থেকে শ্রীমতী যেন নিশ্চয়-নিশ্চয় তাঁর জন্যে একখানা লোমওয়ালা তোয়ালে আর একটা বড় কাঁচি নিয়ে আসে। পরে টাকা দেবেন, এমাসে অতিথি আসাতে বড় টানাটানি।

হাওড়ায় শ্রীমতীর মা তাকে নেবার জন্য পুরোনো নেপালী চাকর পাঠিয়েছিলেন। ট্যাক্সি করে সে তাকে টালিগঞ্জে মায়ের বাড়িতে নিয়ে এল। মায়ের বাড়ি কি তারও বাড়ি নয়? বাড়ি দেখে গর্ব হল, হলদে রঙের ছোটো দোতলা, সামনে বাগান, বাগানে বকুল গাছে ফুল ফুটেছে। সবুজ ঘাস, লাল কাঁকরের পথ।

ট্যাক্সি থেকে নেমে শ্রীমতী দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতেই জরিপাড় শাদা শাড়ি-পরা আধাবয়সী এক নারী পাশের বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করে ঠাণ্ডা দুই ঠোঁট দিয়ে তার মুখচুম্বন করলেন। পুরোনো হাতির দাঁতের মতো তাঁর গায়ের রঙ, আবেণী-সংবদ্ধ কুঞ্চিত কেশদামে রুপোলীর ছটা বড় একটা চোখে পড়ে না। কোমল দোহারা শরীর, নিখুঁত ভুরু, ঈষৎ কোটরগত আকর্ণ-বিস্তৃত চোখ, যেন বড় বেশি চকচকে, চোখের কোণে ঘন নীল ছায়া পড়েছে। চোখে কাজল টানা, ঠোঁট দুটি বড় বেশি পাতলা, অসন্তুষ্ট, ব্যথিত। দু'হাত দিয়ে কাঁধ দুটি ধরে, একটু দূরে সরিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে শ্রীমতীকে আপাদমস্তক তিনি নিরীক্ষণ করলেন। সে প্রণাম করবার সুযোগও পেল না। গলার ভেতর কি একটা বেদনা টনটন করে উঠল। বিস্ফারিত চোখ মেলে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শ্রীমতী।

পদ্মাসনা নিজেই প্রথমে কথা বললেন, "সত্যিই কি তুমি শ্রীমতী? আমার সেই দেড়বছরের খুকুকে কৈ কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না! লেখা-পড়া শিখিয়ে রমেশ চৌধুরী তাকে অন্য মেয়ে বানিয়ে দিয়েছে। এস, ঘরে বসবে এস, বেলা হয়ে গেছে, ক্লান্ত হয়েছ। বস, চা এনে দেবে এক্ষুনি, তারপর স্নান খাওয়া। আমি তোমার মা, আমার বাড়ি তোমার-ও বাড়ি।"

শ্রীমতী চোখ তুলে দেখে বসবার ঘরের পর্দা ধরে আরেকজন আধাবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। শ্যামলা গায়ের রঙ, মোটাসোটা দেখতে, মাথায় এলোখোঁপা বাঁধা, পান খেয়ে দুই ঠোঁট কালো।

"কি দেখছ শ্রীমতী? আমার নাম মতিরানী, আমি তোমার মায়ের কুড়ি বছরের পুরোনো বন্ধু, কাজেই তোমার মাসিমা হই। অবিশ্যি তোমার মায়ের নামডাক হবার পর থেকে এ-বাড়িতে আমার আদর অনেকখানি কমে গেছে। তবু ভাবলাম এখন দু'জনেই রিটায়ার করেছি, এখন আর ওসব পুরোনো কথা কেন, যাই গিয়ে পদ্মার বি. এ.-পাশ মেয়েটি কেমন দেখে আসি।"

শ্রীমতীর মায়ের মন কঠিন হয়ে উঠল।

তিনজনে বসবার ঘরে এসে নরম গোলাপী কুশনের উপর বসলেন। মতিরানী শ্রীমতীর শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ, শাদাসিধে বেশ, অলঙ্কার-বিহীন মাধুরী মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, "হাসি পায় রে পদ্মা, শেষটায় তোর মেয়েও বি. এ. পাশ করল! উনত্রিশ সালে সেই লক্ষ্ণৌ যাবার কথা মনে পড়ে তোর? সেবার তুই—"

পদ্মাসনা বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি এবার বাড়ি যাও মতিরানী, মেয়ে এখন স্নানটান করবে।"

মতিরানী উঠে পড়ে কাষ্ঠ হেসে বললেন, "পুরোনো দিনের সে-সব কথা তোমার শুনতে ভালো না লাগলেও, তোমার বি. এ.-পাশ মেয়ের মজা লাগতে পারে!"

মতিরানী চলে গেলেন। মায়ের জন্য শ্রীমতীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হল। মায়ের দিকে ফিরে বললে, "মা তোমার বাড়িটি আমার ভালো লেগেছে।"

পদ্মাসনা বললেন, "মুখ্যু মা'র সঙ্গে থাকতে রাজী হলে না, তবু যে বাড়িটি ভালো লেগেছে সে আমার সৌভাগ্য। তবে আমি ম'লে তুমি এ-বাড়ি পাবে কিনা সন্দেহ। অনেক টাকায় বন্ধক রাখা আছে।"

তারপর মায়ের সঙ্গে কি কথা আলোচনা করবে শ্রীমতী? তার কণ্ঠ-রোধ হয়ে আসে, চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে মাকে 'মা' বলে ডাকবার জন্য। কিন্তু মা বললেন, "শ্রীমতী তোমার গয়না-গাঁটি, ভালো কাপড়-চোপড় না-থাকলে আমায় বলবে। আমার বন্ধুবান্ধবের সামনে গর্ব করে তোমাকে যেন দেখাতে পারি। আচ্ছা, তোমার গায়ের রঙটা এত কালো হয়ে গেল কি করে? ছেলেবেলায় আমি তো খুব সাবধানেই রেখে-ছিলাম। সরষের তেলটুকু কোনোদিন গায়ে ছোঁয়াতে দিইনি। তারপর এরা নিশ্চয় আর যত্ন নেয়নি, একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে তোমার রঙটা।"

কি একটা গভীর আকুলতা শ্রীমতীর চিত্তে জাগে। ধরা গলায় বলে, "না, মা। তাঁরা আমাকে বড় ভালোবেসে, বড় যত্ন করে মানুষ করেছিলেন। কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেননি। ত্রুটি সব আমার নিজের। আমার রঙটাই কালো।"

জীবনে এই প্রথম শ্রীমতী তার কালো রঙ নিয়ে কুণ্ঠিত হ'ল। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "রঙ দিয়ে কি হবে মা? কতরকম কাজ শিখেছি তাঁদের বাড়িতে, সেলাই শিখেছি, রান্না শিখেছি, লেখাপড়া শিখেছি"—পদ্মা বাধা দিয়ে উঠে পড়েন, "চল তোমাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিই।"

স্নান করতে গিয়ে রমেশ চৌধুরীর মুখখানি মনে করে শ্রীমতী প্রাণ-ভরে কাঁদল।

স্নান সেরে শোবার ঘরে এসে দেখে মা একখানি গোলাপী মাদ্রাজী শাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"এইটে পর শ্রীমতী। তোমার জন্য কিনে রেখেছিলাম। খাবার পরই দেখবে আমার সব বন্ধুর দল তোমাকে দেখতে আসবে—পদ্মাসনার আবার বি. এ.-পাশ মেয়ে! জানো, ওরা আমাকে হিংসা করে। আমার রূপ আছে তাই ওদের চেয়ে নাম-ডাকও বেশি, তার উপরে মেয়ে আমার বি. এ. পাশ করেছে!"

শ্রীমতী কৃতজ্ঞচিত্তে মায়ের দেওয়া এই প্রথম উপহার হাতে নিয়ে বলল, "কি সুন্দর শাড়ি! আমার খুব ভালো লেগেছে। এই রঙের জামাও আছে আমার। মা, বি. এ. পাশ করাটা আর এমন কি! অমন হাজার মেয়ে বি. এ. পাশ করে। সকলে তারা চাকরী পর্যন্ত পায় না। ওতে কোনো বাহাদুরীই নেই!"

পদ্মা সেকথার উত্তর না-দিয়ে বলেন, "আমার বন্ধুদের সব কথা চুপ করে তুমি শুনে যেও। সব কথা বিশ্বাস কোরো না। আবার মনের কথা কাউকে বলতেও যেও না। ওরা প্রকৃত তোমার শুভাকাঙ্খী কিনা সন্দেহ। এখন কাপড় পরে নিচে এস। রান্না তৈরি।"

মা নিচে নেমে গেলেন। শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী নিজের মুখখানি অনেকক্ষণ ধরে দেখল। এই তো সেই চিরপরিচিত মুখ, তার কত দিনের সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকে এই মুখ সে জানে, ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে। তিলগুলি, ঠোঁটের কোণের সেই টানটি তার কত চেনা, কানের পাশে কোঁকড়া চুলের গুছি দুটি কত পরিচিত। আজ মনে হল তার মুখের রঙ বড় কালো। তার অমন সুন্দরী মায়ের মেয়ের অযোগ্য। আয়নার সামনে সাজানো প্রচুর প্রসাধনের সামগ্রী রয়েছে। তাড়াতাড়ি সে গালে একটু ক্রীম লাগিয়ে, পাউডার মেখে নিল, ঠোঁটে একটু রঙ, চোখে সরু করে সুর্মা টেনে দিল। আবার মুখখানি দেখল ভালো করে। তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে সাবান দিয়ে মুখ

ধুয়ে একটু শুধু পাউডার মেখে, কপালে একটা কুমকুমের টিপ পরে, নিচে নামল।

খাবার টেবিলে তিনটি জায়গা করা। বিলেতী বেশধারী অতিশয় কায়দাদুরস্ত, অতিশয় সুদর্শন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি তৃতীয় আসনে বসে ছিলেন। পদ্মা পরিচয় করিয়ে দিলেন, "নমস্কার কর শ্রীমতী, ইনি আমাদের ডিরেক্টর ছিলেন, মিস্টার নাগ। এই আমার মেয়ে, পরেশ। কেমন লাগছে?"

মিস্টার নাগ বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকপূর্ণ চোখে শ্রীমতীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, "স্ট্রেঞ্জ! কে বলবে এত বড় মেয়ে তোমার। গানটান শিখেছ মা?"

শ্রীমতী বললে, "চলনসই গোছের। কিন্তু আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি, একদিন খেয়ে দেখবেন। মা, আমি কিন্তু একদিন রান্না করব।"

মা বললেন, "তবেই হয়েছে। আমার গোমেশটিকে তুমি দেখছি তাড়িয়ে ছাড়বে! এস, বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

মজলিসি লোক এই মিস্টার নাগ। বহু বৎসর ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কত আশ্চর্য গল্প করতেই যে পারেন! শ্রীমতী সব কুণ্ঠা ভুলে গিয়ে অকপট চিত্তে হাসতে পারল তাঁর সামনে। আহারান্তে বসবার ঘরে মজলিস বসল। পান, সিগারেট এল। মিস্টার নাগ শ্রীমতীকে জিগগেস করলেন, "টিচারি করতে তোমার ভালো লাগে, শ্রীমতী?"

শ্রীমতী বললে, "খুব ভালো লাগে। আমাদের মিস বিশ্বাস খুব ভালো লোক। আমাদের মেয়েরা খুব ভালো মেয়ে, পড়াশুনায় খুব ভালো নয়, কিন্তু মানুষ খুব ভালো। চাঁপাডাঙাও খুব ভালো জায়গা।"

মিস্টার নাগ দুই ভুরু কপালে তুলে বললেন, "হিয়ার! হিয়ার! ভালো লাগবার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আজকাল সচরাচর দেখা যায় না!"

শ্রীমতী লজ্জা পেয়ে নীরব হল।

পদ্মা বললেন, "সবই না হয় ভালো বুঝলাম, কিন্তু টাকা দেয় বড়

কম। ওতে কি করে হয় তোমার? জীবনে কি কোনো শখসাধ নেই?"

শ্রীমতীর বুকের ভেতরটা একটু কঠিন হয়ে আসে। "ওতেই আমার বেশ চলে যায়, মা। মাসকাবারে আমার কত পয়সা আরো বাঁচে। মাঝে-মাঝে বইটই কিনি। কি সুন্দর গালচে কিনেছি জানো মা।"

মিস্টার নাগ বললেন, "কুয়োর ব্যাঙও মনে করে গোটা পৃথিবীটাই সে পেয়ে গেছে! তোমার কি কোনো উচ্চাভিলাষ নেই, বলছ? চাঁপা-ডাঙায় তুমি কি সবই পেয়েছ বলতে চাও?"

শ্রীমতীর চোখের সামনে থেকে এক পলকে সেই সাজানো ড্রয়িংরুম যেন মুছে গেল। কোনো এক বাঁশঝাড়ের পিছনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শুনতে পায় কানের কাছে শুভেন্দুর জলদগম্ভীর স্বর: "যা চেয়েছিলে পেয়েছ এখানে?"

শ্রীমতী মাথা নাড়ে। যেটুকু পাওয়া যায় তার চেয়ে আরেকটু বেশি না-চাইলে চাওয়ার কি বা সার্থকতা! শুভেন্দুর শ্যাম সুন্দর মুখ-খানি মনে পড়ে।

মিস্টার নাগ বলেন, "অন্য লাইনের প্রস্পেক্টস অনেক বেশি শ্রীমতী। ত্রিশ বছর পরে রিটায়ার করবার সময় এলে দেখবে মাইনে হয়তো একশো টাকা বেড়েছে। বড় জোর একশো টাকা, তার বেশি নয়। টিচারি করা একটা ড্রাজারি, একটা থ্যাঙ্কলেস টাস্ক্।"

শ্রীমতী সজোরে এ-কথার প্রতিবাদ করে, "না, না, কক্ষনো ড্রাজারি নয়। আমি এতেই আনন্দ পাই। মেয়েরা আমাকে সত্যি ভালোবাসে। থ্যাঙ্কলেস হবে কেন?"

আলোচনা ওখানেই বন্ধ হল। আরো অতিথির সমাগম হল ক্রমে। মায়ের বন্ধুরা সব শ্রীমতীকে দেখতে আসছেন। শ্রীমতী তাঁদের মিষ্টি কথায় আপ্যায়ন করে। কখন এক সময় অতিথির পদ ত্যাগ করে সে এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে যায়, নিজেও বুঝতে পারে না।

এক কথায় অতিথিদের বর্ণনা দেওয়া যায় না। তাঁদের নানান বয়স,

নানান অবস্থা, নানান স্বভাব, নানান বেশভূষা। কিন্তু থিয়েটারের কিম্বা সিনেমার সঙ্গে সকলেরই একটা যোগসূত্র আছে। বেশ লাগে এদের। পঁচিশ যার বয়স সেও যেমন সুন্দরী, যার পঁয়তাল্লিশ সেও তেমনি। ভগবান যাকে সুন্দরী করে গড়েননি, সেও নিজেকে নিখুঁত চেষ্টায় রূপবতী করে তুলেছে। শ্রীমতী মুগ্ধ হয়। তাঁদেরও ভালো লাগে অহঙ্কারী পদ্মাসনার কোমলস্বভাব শ্যামলী কন্যাটিকে। মতি-বানীও দেখা গেল এসেছেন।

"কি গো শ্রীমতী? তুমিও সিনেমা করবে নাকি? তাহলে ভাব করে নাও আমার সঙ্গে। জানো, আমিই তোমার মাকে অ্যাক্‌টিং শিখিয়ে-ছিলাম, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম সবার সঙ্গে। সেসব কথা পদ্মা হয়তো ভুলে গেছে।"

মতিরানীর পাশে যিনি বসেছিলেন, যৌবন তিনি অতিক্রম করেছেন, সত্যিকারের সুন্দরীও বলা যায় না, কিন্তু চোখে-মুখে একটা ছাপ আছে, চলনে-বলনে একটা বিশিষ্টতা আছে, যা তাঁকে সকলের থেকে পৃথক করে। উঠে এসে তিনি শ্রীমতীর পাশে বসলেন। সেই একই কৌতূহল সকলের মনে! "তোমার নিজের কাজ তোমার ভালো লাগে শ্রীমতী?"

শ্রীমতী বলে, "খুব ভালো লাগে। আপনি—?"

হেসে মহিলাটি নিজের নাম বললেন। আরে, তাইতো! এই যশস্বিনী অভিনেত্রীকে কে না জানে! শ্রীমতী চিনতে পারল।

মতিরানী বলেন, "কি দেখছ, শ্রীমতী? উনিও বি. এ. পাশ। অ্যাক্‌-ট্রেসদের বিরুদ্ধে তোমার যা বলবার আছে এখন বল। উনি তার উপযুক্ত জবাব দেবেন।"

শ্রীমতী মাথা উঁচু করে বলে, "অ্যাক্‌ট্রেসদের বিরুদ্ধে আমার তো কিছু বলবার নেই। মানুষকে আনন্দ দিতে পারা তো সৌভাগ্যের কথা। তাছাড়া আমি নিজেও অ্যাক্‌ট্রেসের মেয়ে।"

পাশের বিখ্যাত মহিলাটি শ্রীমতীর পিঠে সস্নেহে হাত রাখলেন। বহুদিন পরে পদ্মার প্রাণ আজ কানায়-কানায় ভরে উঠল। "বলিনি তোমাদের? আমার মেয়ের মতো মেয়ে আছে!"

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শ্রীমতীর মনে পড়ে মায়ের মুখখানি। ভাবে আমার দুঃখিনী মাকে সুখী করতে হবে। কি বা পেয়েছেন আমার মা এই পৃথিবীতে? অমন রূপ যাঁর, তাঁর কত সুখী হওয়া উচিত ছিল। কি সুন্দরী মা আমার! আমাদের এখন তিনপুরুষ কালো চেহারা হলেও দোষ নেই।

ঘুম আসে না। মনে পড়ে ছুটির আগে বেলামাসির চিঠি। লিখেছেন—পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আষাঢ় মাসের পাঁচ তারিখে। সেই গুণবান পাত্রটির সঙ্গেই। শুভেন্দুর কবে সুবুদ্ধি হবে তার জন্য কতদিন আর বসে থাকা যায়! তাছাড়া ছোট বোন এলার মেয়ে লকেট্‌কেও তো একটা চান্স দেওয়া উচিত। বিয়েতে তোমার আসা চাই, তুমি অনেক কাজের ভার নেবে—ইত্যাদি।

এলামাসি লিখেছেন—ছুটিতে শ্রীমতী কি করবে, কোথায় যাবে এ-বিষয়ে কিছু জানায়নি কেন? লকেট্‌কে নিয়ে পেরে ওঠা দায়। সাজপোশাক একরকম ছেড়েই দিয়েছে, কোথাও যেতে চায় না, দিন-রাত বই নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে। কিছু বললে বলে, আসচে বছর বি. এ. পরীক্ষা, তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ব্যাপার দেখে এলামাসিরও খুব মন খারাপ। তাছাড়া পরীক্ষার আগেই লকেটের একুশ বছর পূর্ণ হবে। ঐ ছোকরা কি কুমন্ত্রণা দেবে কে জানে! হয়তো শেষ অবধি বাপ-মাকে 'ডিফাই' করবে। এলামাসি কিছুতেই তা সহ্য করবেন না দরকার হলে লকেট্‌কে ঘরে তালাচাবি দেবেন। মুশকিল হচ্ছে বকেট্‌কে দিয়েও বিশ্বাস নেই। সেও আজকাল লকেটের পক্ষ নিয়ে

অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করেছে। সামনে পুতুলের বিয়ে। বিয়েবাড়ির গোলমালে কি হয়, কে জানে! শ্রীমতী একবার এলে ভালো হয়। ইত্যাদি—

আর শুভেন্দু? মিনিদির চিঠিতে শুভেন্দুর খবর ছিল। কি নাকি একটা বই লিখবার চেষ্টায় আছে শুভেন্দু, কোনো একটা নীরস বিষয় নিয়ে, আইন-টাইন হবে। তার দেখা পাওয়াই দায়। মিনিদি এর মধ্যে আবার দার্জিলিঙ ঘুরে এসেছে। বোধহয় শ্রীমতীর ব্যবহারেই শক পেয়ে তাঁর মা আরো ইমপসিবল হয়ে উঠেছেন। সাতদিনের বেশি দার্জিলিঙে থাকা অসম্ভব। শুধু মিনিদি তাঁর মেয়ে বলে, আটদিন ছিল। তাছাড়া এবার দার্জিলিঙটাও ভালো লাগছিল না। রেগেমেগে একটা বিয়েই করে ফেলবে কিনা ভাবছে।

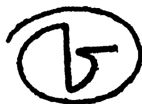
শ্রীমতী ভাবে দেড়মাস ছুটির পাঁচ সপ্তাহ মায়ের কাছে থেকে শেষ সপ্তাহে বেলামাসির কাছে যাবে। বেশ হবে—পুতুলের বিয়ে। বিয়ে-বাড়ি ভালোই লাগে তার।

এখনো এলামাসি-বেলামাসিকে মায়ের মনে আছে। তাঁদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব ছিল না, তাঁরা নাকি চিরকাল বড্ড অহঙ্কারী। তার চেয়ে তাঁদের ভাজ মিলি অনেক ভালো, যদিও ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি আদৌ নেই, এবং স্বামীটি একটি লক্ষ্মীছাড়া। সকলের সব খবরই মায়ের জানা আছে।

এত খবর মা পেলেন কোথায়? কেন, শ্রীমতীর সঙ্গে কি ছোটদাদা-মশায়ের আলাপ হয়নি? যত সব থিয়েটার স্টুডিয়োতে তাঁর আনাগোনা, তাই বলে একেবারে নির্গুণ নন। স্টেজ সাজাবার, সীন ডিজাইন করার কাজে বেশ নাম করেছেন। মাসে একবার অন্তত এখানে এসে চা খেয়ে যান। শ্রীমতীর জীবনের মোটামুটি সব খবরই তাঁর কাছ থেকে শোনা। আর দুঃখের সময়, বিপদের সময়, অমন একটি বন্ধু পাওয়াও দায়।

আশ্চর্য লাগে তার। ছোট দাদামশায়কে শৈশব থেকে দেখে এসেছে, অথচ মায়ের খবর কখনো জিগগেস করবার কথা মনে হয়নি। এই লোকটির বিষয়ে এতদিন সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, হঠাৎ তাঁকে ভালো লাগল।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে। শ্রীমতীর চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। দূরে কাদের ঘড়িতে দুটো বাজল।



শ্রীমতীর জীবনের সুর তাল কেন সব সময়ে ঠিক থাকে না? রমেশ চৌধুরীর স্নেহের নীড়ে বাস করে স্বাধীনতাকে কত না মধুময় মনে হয়েছিল, স্বাবলম্বী হওয়াকে মনে হয়েছিল কত গৌরবের, এখন কেন মাঝে-মাঝে তাল কেটে যাচ্ছে! যে পরের বাড়ির পাঁচজনের কাছেও কত সহজে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, নিজের মায়ের বাড়িতে সে কেন প্রিয় হতে পারছে না?

সে যখন আগ্রহের সঙ্গে মায়ের কাছে চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের গল্প করে, মা পদ্মকলির মতো একখানি শুভ্র সুন্দর হাত দিয়ে কপালে-এসে-পড়া নিজের কোঁকড়া চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে ক্লান্তভাবে বলেন, "তারপর কি হবে? মিস বিশ্বাসকে কি ওরা পেনসন দিয়ে তোমাকে হেডমিস্ট্রেস করে দেবে?"

শ্রীমতী হেসে বলে, "পাগল হলে মা? আমাকে কি করে হেডমিস্ট্রেস করে দেবে? আমি যে সব চেয়ে নতুন টিচার, আমার উপরে বি. এ. পাশ করা বি. টি. পাশ করা আরো সাতজন রয়েছেন। জানো মা?"

পদ্মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন, "এ একশো টাকার গণ্ডি ছাড়াতে তোমার তাহলে জীবন কেটে যাবে শ্রীমতী। আমার মতো যখন বয়স হবে, শরীর মন ভেঙে পড়বে, যখন ইচ্ছে করবে কোথাও পালিয়ে যাই, বড়-বড় গাছের ছায়ায় ফুলের গন্ধে ভরা কোনো একটা আশ্রয়ে, তখনো তোমাকে চাকরি করতে হবে, পালাবার পথ পাবে না।"

শ্রীমতী এ-কথায় বরং উৎসাহ পায়, বলে, "তবে চাঁপাডাঙায় আমার কাছে এখুনি তোমার চলে আসা উচিত। স্কুলের কম্পাউণ্ডে-সেখানে বড়-বড় আম গাছ। আমার বারান্দায় নিমগাছের ছায়া পড়ে। তোমার জন্য রাশি-রাশি ফুল গাছ লাগাব, হাসনাহানা, বেলফুল, মাধবীলতা পুঁতব! যাবে মা, সত্যি যাবে?"

পদ্মা শিউরে উঠে চোখ বুজে বলেন, "তোমার চাঁপাডাঙায় আমি একদিনও থাকতে পারব না!"

শ্রীমতী মায়ের ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পদ্মা বলে যান, "এত ছোট তোমার নজর শ্রীমতী। এতটা বয়স হয়েছে, কিন্তু চোখ তোমার ফোটেনি। তাই দিনের পর দিন, মানুষের চোখের আড়ালে ঐ একঘেয়ে কাজ করে-করে, মনে ভাবছ কি সুখেই আছি! নিজের জীবনটা নষ্ট করে ফেলছ, বোঝ না কেন? আমাকে দেখ, একদিন বিখ্যাত সুন্দরী বলে আমার নামডাক ছিল। আয়নায় তাকিয়ে দেখি আজ তার আর কিছু বাকি নেই। চুল উঠে গেছে, পেছন দিকের দু-তিনটে দাঁত নড়ে গেছে, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। কিন্তু একদিন জীবনটা আমার সার্থক হয়েছিল।" দু'হাতে মুখ চেপে পদ্মা কেঁদে ফেলেন, "কিছু বাকি নেই শ্রীমতী, সব গেছে।"

শ্রীমতী দু'হাতে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, "কিছু নেই কেন বলছ মা? আমি তো আছি। আমার চোখে তোমার মতো সুন্দরী কেউ নেই।"

পদ্মা হাত নামিয়ে, চোখ মুছে, সোজা হয়ে বসলেন। শুষ্ককণ্ঠে বললেন, "সত্যি তুমি আছ। কিন্তু তোমার এই দুঃখিনী মায়ের জন্য কি-ই বা করতে পার, তুমি? একশো টাকা রোজগার করে আমার মেয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে! জানো, গোমেশকে আমি পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিই, আয়া পঁচিশ, বাহাদুর ত্রিশ টাকা পায়?"

শ্রীমতী নীরব হয়ে যায়, গাল লাল হয়ে ওঠে, গলার কাছে একটা শিরা দপদপ করে।

মা সেদিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। বললেন, "ঐ যে আমাদের ডিরেক্টরের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিলাম, উনি আমার পুরোনো বন্ধু বলে তোমাকে একটা চান্স দিতে রাজী আছেন। তোমার রঙটা শ্যামল হলেও নাক চোখ তো ভালোই, একটু মেক-আপ দিলে ছবিতে সুন্দর দেখাবে। গানটানও তো কিছু-কিছু শিখেছ। আজকালকার ভালো ফিল্মে সকলের কিছু গান গাইতেও হয় না—"

শ্রীমতী প্রাণপণে মাথা নেড়ে বলে, "না, না মা, ও আমাকে দিয়ে হবে না।"

পদ্মার মুখ কঠিন হয়ে উঠল, "কেন? লজ্জা হয়? ঘৃণা হয়? পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখতে যাও, আর যারা ফিল্ম তৈরি করে, তাদের ঘৃণা কর? কি আর বলব তোমাকে? আমার মেয়ে আমাকে ঘৃণা করে, আমার বলবার কি আছে বল?"

এমন করে কেউ কোনোদিন শ্রীমতীর হৃদয় মন্থন করেনি। বুকটা টনটন করে ওঠে ব্যথায়। আকুল হয়ে মায়ের হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে বলে, "না মা, তুমি ভুল বুঝছ। তোমার মতো আমার আর কেউ নেই। তুমি সুখী হও আমি তাই চাই।"

পলকে চোখে-মুখে হাসি ফুটল পদ্মার, "তাহলে রাজী আছ তো?"

উত্তর দিতে ঠোঁট কেঁপে যায়। ধীরে-ধীরে শ্রীমতী বলল, "একটু সময় দাও মা, এখনই উত্তর চেও না।"

অপ্রসন্নকণ্ঠে পদ্মা বলেন, "বেশ তাই হোক!"

মা আরো কত প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, গোপনে শ্রীমতীর অন্তরে বিন্দু-বিন্দু চোখের জল জমা হতে থাকল।

এমনি করে সময় কেটে যায়। পুরোনো জীবনের একটানা সেই দিন-গুলি যেন কোন অতীতের ইতিহাস। রোজ পদ্মাসনার কোনো না

কোনো বান্ধবী তার সঙ্গে আলাপ করে যায়। এক পাড়াতেই বাড়ি। মৌমাছির মতো তারা গুনগুন করে, মুখে মধু আর দেহে হুল নিয়ে আসে। এরা কেন আসে? কেন আমার রূপসী মাকে কেউ ভালোবাসে না? কেন ওরা হিংসা করবে? কি আছে আমার বেচারী মায়ের যার জন্য এই অনুচ্চারিত শত্রুতা? আমি আমার মাকে সুখী করব, শ্রীমতী মনে-মনে সঙ্কল্প করল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মাকে সে জিগগেস করল, "মা, আমার বাবা কেমন ছিলেন?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পদ্মা। কি হবে তাঁর কথা জেনে? যখন ওর সাতমাস বয়স সেই তখন অকস্মাৎ একদিন তাঁর মৃত্যু হল। না, এমন কিছুই ছিলেন না তিনি। সত্যি কথা বলতে কি, পদ্মাসনার মতো সুন্দরী স্ত্রীর কোনো অংশেই যোগ্য ছিলেন না। মোটা, বেঁটে কালো দেখতে, কোনো একটা সওদাগরী অফিসের বড়বাবু ছিলেন, মাসান্তে শ'তিনেক টাকা ঘরে আনতেন। সাতাশ বছর বয়সে পদ্মা বিধবা হলেন। ভাগ্যহীনা পদ্মা! পাঁচ বছর বয়সে বাপ-মরা বেচারী পদ্মা! এলা-বেলার কি বা রূপ ছিল, তাদেরও অমন সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হল, আর সুন্দরী পদ্মাসনার কপালে জুটল কিনা মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু!

শ্রীমতী কোমলস্বরে জানতে চায়, "বাবা তোমাকে ভালোবাসতেন?"

বিরক্ত লাগে। "তা বাসবেন না? ও-বাড়িতে যে অমন রাজরানীর মতো বৌ কস্মিনকালেও আসেনি তা নিয়ে গর্ব কি কম ছিল? পছন্দ করে কম দাম দেখে রঙিন শাড়ি-টাড়িও এনে দিতেন মাঝে-মাঝে। কিন্তু ওখানে কোনোমতেই বিয়ে হওয়া উচিত হয়নি।" পদ্মার মায়ের কোনো বুদ্ধি ছিল না, আর দুদিন অপেক্ষা করলে নিশ্চয়ই ভালো পাত্র জুটে যেত। রমেশ চৌধুরীর স্ত্রী পদ্মার মায়ের একরকম মাসতুতো বোন, এমন কিছু দূর সম্পর্কও বলা যায় না, তিনিও যদি বেঁচে থাকতেন

বোনঝির অমন একটা যা-তা বিয়ে হতে দিতেন না তিনি।
"আচ্ছা মা, বাবা নিশ্চয় আমাকেও খুব ভালোবাসতেন, না? কি বলে ডাকতেন?"
"খুকুমা বলতেন, আবার কি বলবেন, তোমার সাতমাস বয়সে তো মারাই গেলেন। তারপর আরো এক বছর বহু কষ্টে ওদের সংসারে শত অভাব অনটন গোঁড়ামির মধ্যেও রয়ে গেলাম আমি। হঠাৎ একদিন কি একটা নিয়ে যেন, এখন মনেও নেই, ঝগড়াঝাঁটি হল খুব। তোমাকে কোলে নিয়ে জন্মের মতো ও-বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। এখন শুনছি বিশেষ কেউ নেইও, সব মরে-ঝরে পরিষ্কার! তোমার আবার এসব নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না।"
শ্রীমতী জানলা দিয়ে রাস্তার আলোমাখা বকুলগাছটার দিকে তাকিয়ে তার মোটা বেঁটে স্নেহশীল কালো বাবার কথা ভাবে। মরে গিয়ে মানুষ সত্যি যদি আবার জন্মায়, তবে এতদিনে হয়তো বড় হয়ে আবার কলেজে-টলেজে পড়ছেন, হয়তো আর কোনো দেশে, বিলেতেই হয়তো। এ-জন্মে কি সত্যি অনেকে তাঁকে ভালোবাসে?
পদ্মা পুরোনো প্রসঙ্গ তুললেন, "সেদিনের কথাগুলি ভালো করে চিন্তা কর শ্রীমতী। আমার কথামতো চললে তুমি সুখীই হবে। আমি তোমার মা হয়ে কখনো তোমাকে অসুখী করতে চাই না।"
না, মায়ের মনে আর সে কষ্ট দেবে না। বলবে না—রূপ নিয়ে, যশ নিয়ে কই তুমি তো সুখী হওনি, মা? রূপযশ নিয়ে কেউ কি কখনো সুখী হয়? যাক সে-কথা। একা বসে ভাবে, চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলে ক'জনে তখনো সুখী থাকতে পারে? এলামাসি, বেলামাসি, চারুশীলাদিদি, মিলিমামিমা, অমরেশবাবু কে বা সুখী? আর রমেশ চৌধুরী? এ'দের পাশে তাঁর মুখখানাও মনে পড়ে। তিনি তো সুখী ছিলেন! তারপর ছোটদাদু? অনেকে তাঁকে দুষ্টলোক বলে, কিন্তু তাঁকে দেখে তো মনে হয় অতিশয় সুখী তিনি। লকেট্-বকেট্রা

কি সুখী? মিনিদি, শুভেন্দু, আমি, কে সুখী? যারা সুখ আশা করে তারা সুখী বই কি। ঘুম এসে চিন্তার জাল ছিঁড়ে দেয়।

পরদিন সকালে উঠে দেখে আকাশ মেঘে ঢাকা।

চায়ের টেবিলে মাকে না দেখে শ্রীমতী তাঁর শোবার ঘরে গেল। ঘরের দরজায় নেপালী আয়া বসে আছে। বলল, মাইজী অসুস্থ। উদ্বেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখে ফিকে সবুজ বালিশে মাথা রেখে ফিকে সবুজ বিছানাতে, ফিকে সবুজ চাদর গায়ে মা এলিযে পড়ে আছেন, মেঘের মতো এলিয়ে পড়েছে চুলের রাশি। ক্লান্ত চোখ দু'টিকে আরো বড় দেখাচ্ছে, চোখের কোণে কালি।

অস্থির পায়ে শ্রীমতী মায়ের শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে বলল, "কি হয়েছে মা?"

"বুকটা কি রকম করছে, শ্রীমতী। মাঝে-মাঝে এরকম হয়, ব্যস্ত হয়ো না।"

"না না, আমি ডাক্তার ডাকি?"

"ডাক্তার এসে কি করবে? ড্রেসিং টেবিলের ওপর ঐ বড়ি আছে, একটা খাইয়ে দাও। বলছি তো, এরকম আমার হয়। এর একমাত্র ওষুধ সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি। আমার এবার মৃত্যুই ভালো, শ্রীমতী। আর বেশি বেঁচে থাকা মানে আরো কষ্ট পাওয়া। সারা জীবনটাই কষ্ট পেয়ে গেলাম। ঐতো একশো টাকা পাও তুমি, ওতে তো আর মায়ের সেবা চলে না। আমার জন্য চিন্তা কোরো না শ্রীমতী। ভাগ্যে যা ছিল তাই তো হবে।"

শ্রীমতী কি বলবে ভেবে পেল না।

"মাগো, আমি এক বছরের কনট্র্যাক্ট সই করেছি, একটা বছর আমাকে সেখানেই থাকতে হবে।"

"বেশ তো, এক বছর পূরে গেলেই চলে এস। নিজের মায়ের কাছে আসবে, তাঁর আশ্রয়ে থাকবে, তাঁর সেবা করবে, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? জলে তো পড়বে না। এলা-বেলারা নিশ্চয়ই মহা গোলমাল করবে, তোমাকে কত কি বোঝাবে। আমার দিকটা কোনো-দিনওঁ ওরা চিন্তা করেনি, এখনো করবে না। তোমার মন ভাঙবে না তো?"

"মা, নিজে যেটা ভালো বুঝব চিরকাল সেইটা করতে দাদাবাবু শিখিয়েছিলেন। আমাকে মাঝে-মাঝে বলতেন, একা এসেছিস, একা যাবি, আবার মন ঠিক করতে দোকার কি দরকার? বেশ কথা না, মা?"

মা অপাঙ্গে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। "তুমি কি রমেশ চৌধুরীর প্রতিধ্বনি? তোমার নিজস্ব কিছু নেই?"

শ্রীমতীর চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। "না মা, মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গেও আমার মতে মিলত না। ভারি খুশি হয়ে তখন আমার সঙ্গে তর্কে মেতে যেতেন। অদ্ভুত সব যুক্তি উপস্থিত করতেন, যে-সব খণ্ডাতে আমাকে দস্তুরমতো বেগ পেতে হত এক-একদিন।"

চোখ বুজে পদ্মা ফিরে শুলেন। "যাঁরা মরে গেছেন তাঁদের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে কি করে আব লড়াই কবব বল? তুমি যাও, স্নানটান কর গিয়ে। একবার গোমেশকে দিয়ে মিস্টার নাগকে খবর দিও। মাঝে-মাঝেই এরকম হার্টের দোষ হচ্ছে, বিষয়-আশয় যেটুকু আছে তার তো একটা ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। আমার গহনাগুলি ছাড়া তুমি কিছুই পাবে না, শ্রীমতী। ঋণের জন্য এ-বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে। যেমন টাকা রোজগার করেছি, দু'হাতে খরচও করেছি। ভেবেছিলাম রমেশ চৌধুরী তোমার নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে যাবে। সে যে এমন করবে তা তো ভাবিনি।"

"মা, থাক ওসব কথা এখন, তুমি ভালো হয়ে ওঠ। আমার জন্যে একটুও ভেব না তুমি। দাদাবাবুর কাছে কিছুই কি আমি শিখিনি?

তুমি ভেব না মা। তোমাকে একটু দুধ এনে দিই কেমন? না খেলে যে দুর্বল হয়ে যাবে।"

ব্যস্তসমস্তভাবে শ্রীমতী মিস্টার নাগকে একখানি চিঠি লিখে পাঠাল। দুপুরে মিস্টার নাগ এসে কাগজপত্র নিয়ে বসলেন। পদ্মাসনা একটু সুস্থ বোধ করছিলেন, নিচে নেমে এসে আরাম কেদারায় বসলেন তিনিও। শ্রীমতী রেফ্রিজারেটর থেকে ঠাণ্ডা দুধ এনে তাতে লেবুর রস আর চিনি মিশিয়ে খেতে দিল মাকে।

পদ্মাদেবী স্নেহভরে শ্রীমতীর পিঠে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, "ও পরেশ, মেয়ে যে তোমাদের রূপালী পর্দাকে একটা চান্স দিতে রাজী হয়েছে! ইস্কুলে ওর একটা বছর পুরে গেলেই ও বুড়ো মায়ের কাছে চলে আসবে। আমার দুঃখুও ঘুচবে।"

মিস্টার নাগ নির্বাক বিস্ময়ে ম্রিয়মানা শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকালেন। চেষ্টা করে একটু হেসে বললেন, "তোমার দুঃখু ঘোচাবে এমন কারো সাধ্যি নেই, পদ্মা। তবে তুমি যে অতিশয় বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" গম্ভীর মুখে পুনরায় তিনি কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন।

মিস্টার নাগ চলে গেলে বহুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন মা-মেয়ে দুজনে। তারপর পদ্মা বললেন, "কারো কথায় কান দিয়ো না, শ্রীমতী। মনে রেখো মায়ের চেয়ে যার টান বেশি তার নাম ডান। কিন্তু আমার আবার বুকে কেমন করছে, যাই গিয়ে শুয়ে পড়ি। গোমেশকে ও-বেলা হালকা রকমের রাঁধতে বল। রান্নাঘরে যাবার দরকার নেই তোমার, এখানেই ডেকে পাঠিয়ে বলে দাও।"

মাকে ঘরে পেঁছে দিয়ে, শ্রীমতী ঘর অন্ধকার করে দিল, পাখা খুলে দিল, দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ পথের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

একটু পরে ছোট একখানি গাড়ি গেটের কাছে দাঁড়াল এসে। চালকের

আসন থেকে যে আধাবয়সী সুবেশা মহিলা নেমে এলেন শ্রীমতী তাঁকে চেনে। বিখ্যাত সুনয়নী বন্দ্যোপাধ্যায়কে না চেনে কে? তার উপর মায়ের বাড়িতে সেই প্রথম দিনের স্নেহস্পর্শ তার পক্ষে ভোলা অসম্ভব।

নিচে গিয়ে ম্লান হেসে সুনয়নীকে বসাল শ্রীমতী। "মায়ের শরীর আজ ভালো নেই। আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।"

"আমি তোমার কাছে এসেছি, শ্রীমতী। এস, কাছে বস। পরেশ নাগের কাছে শুনলাম তুমি নাকি কাজ ছেড়ে চলে আসবে পদ্মার কাছে? নাকি অভিনয় করবে! তবে না তোমার কাজটি তোমার ভারি ভালো লাগে?"

অতিকষ্টে ঢোক গিলে শ্রীমতী বলল, "আমার মা'র হার্ট খুব খারাপ। তাঁর যত্ন দরকার, বিশ্রাম দরকার। আমার একশো টাকায় তো চলবে না। আরও যে অনেক টাকা চাই। নইলে মা'র বড় কষ্ট হবে।"

উন্মুক্ত দৃষ্টি শ্রীমতীর চোখের উপর নিবদ্ধ করে সুনয়নী বললেন, "পদ্মা জীবনে বহু লক্ষ টাকা রোজগার করেছে, তার কি কিছুই নেই?"

"রোজগারও করেছেন দু'হাতে খরচও করেছেন। এ-বাড়িও বন্ধক দেওয়া, বিক্রি হয়ে যাবে। আমি ছাড়া মা'র কেউ নেই।"

সুনয়নী মৃদুকণ্ঠে বললেন, "পদ্মার বিষয়-আশয়ের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। ওর হার্ট যে এত খারাপ বলছ, তুমি কি করে জানলে? ডাক্তার এসেছিলেন?"

"না। আজ আসেননি। কিন্তু মা'র ওরকম মাঝেমাঝেই হয় বললেন।"

সুনয়নী দেবী উঠে এসে শ্রীমতীর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালেন, "নিত্য আসি যাই, কই আমি তো একথা কখনো শুনিনি!" তারপর গভীর কণ্ঠে বললেন, "শোনো শ্রীমতী, জীবনটা ফেলে দেবার জিনিস নয়। এর ভালো-মন্দর জন্য তোমাকেই দায়ী হতে হবে। ভালো করে না-ভেবে তুমি কিছুই স্থির কোরো না। আর আমাকে দিয়ে কোনোদিনও যদি

কোনো কাজ হয়, একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিও, আমি আসব।" বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে; শ্রীমতী। সে সুখে সংসার করছে। তাকে আমি পনেরো বছব দেখিনি। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই। তুমিও যেন আমাব মতো বযস হলে মনকে বলতে পার, কিছু পেযে থাকি আর নাই পেয়ে থাকি, আমার কোনো দুঃখ নেই।"

শ্রীমতীর চোখের জল বাধা মানে না। কোমল কণ্ঠে বলে, "না-বুঝে আমি কোনো কাজ করতে চাই না। আপনাকে আমি চিরদিন মনে রাখব। দরকার হলে স্মরণ করব বই কি।"

এদিকে পদ্মা বেশ দ্রুত সুস্থ হযে উঠলেন। শ্রীমতীকে সঙ্গে করে মিস্টার নাগদের স্টুডিও দেখিযে আনলেন একদিন। বাড়িতে মস্ত পার্টি দিয়ে বহু হীরকোজ্জ্বল অতিথির সঙ্গে শ্রীমতীব পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিন সে মা'র কাছে ফিকে নীল সিফনের শাড়ি, সরু একছড়া আসল মুক্তোর মালা উপহাব পেল। বড় আলমারি খুলে নিজের কাপড় গহনার রাশি থেকে মেয়ের উপযুক্ত জিনিস সযত্নে নির্বাচন করে দিলেন পদ্মাসনা।

শ্রীমতী সেদিন রান্নাঘরে গিয়ে নিজে মাংসেব কাবাব কবেছিল, গোমেশের ঢাকাই পরটা তৈরি কবা দেখেছিল। গুঁড়ো মসলা দিযে ছোট-ছোট বেগুনের চাটনি বানানো হল, মনের মতো করে বাড়িঘব সাজানো হল। পদ্মার অভিজ্ঞতা আর সুরুচি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল শ্রীমতী। ছাদের উপর ছোট ঘরে গিয়ে বিশাল ট্রাঙ্ক থেকে পদ্মা সেদিন সুন্দর সুন্দর পর্দা, গালচে, ফুলদানি বের করে এনেছিলেন।

সন্ধ্যেবেলা জন পঞ্চাশেক অতিথি এলেন। শাদা জর্জেটে সুন্দর মানিয়েছিল সুনয়নী দেবীকে। মতিরাণীও এসেছিলেন, রবাহূত হয়ে।

শ্রীমতীর শত অনুরোধেও পদ্মা তাঁকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাননি। বেগুনি বেনারসী পরে হাসিমুখে মতিরাণী শ্রীমতীর সঙ্গে নিজে থেকেই অতিথি সেবায় মেতে উঠলেন। পদ্মাদেবী একটি কথাও বললেন না তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাতেও মতিরাণীর আনন্দের স্রোতে ভাটা পড়েনি। শেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে পদ্মাদেবী শ্রীমতীর সঙ্গে বসবার ঘরে এসে ক্লান্ত দেহে বসে পড়লেন।

"কত রাত হয়ে গেল শ্রীমতী! যাক ভালোভাবেই শেষ হল পার্টি। সত্যি তুমি চমৎকার খাবার করতে পার, সবাই তারিফ করেছে। গোমেশটাও একটা রত্ন। বন্ধু হলে কি হবে, আমি সন্দেহ করি পরেশটা পারলে ওকে ভাগিয়ে নেয়। আর মতিরাণীর কাণ্ডটা দেখলে? একটুও যদি আত্মসম্মান থাকে! দিব্যি এসে কাজে লেগে গেল, কতই যেন আপনার লোক! নিশ্চয় খেয়ে-দেয়ে গেল?"

"না, মা, উনি একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন, আমি তাই দুটো কেকের বাক্স ভরে খাবার দিলাম, বাড়ি গিয়ে স্নান করে খাবেন।"

"তোমার যত বাড়াবাড়ি শ্রীমতী! ওসব লোককে বেশি আস্কারা দিলেই মাথায় চড়বে। সাজের বহরটা দেখলে তো? ভদ্রসমাজের উপযুক্ত দুটো কথাও বলতে পারে না। তবু আসা চাই।"

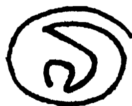
ব্যথিত হয়ে শ্রীমতী বলল, "আহা বেচারা বড় একা। ওঁর যে কেউ নেই। খুব কিন্তু খাটতে পারেন, একটুও বিরক্ত হন না। বললেন, তুমি নাকি যখন প্রথম এসেছিলে ওঁর অবস্থা বেশ ভালো ছিল, উনিও একটা [illegible] দিয়ে সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি মা, ওঁর মনটা খুব ভালো!"

"আর হাসিও না বাপু! সে-পার্টির কি না ছিরি! যত সব আজেবাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক এনে জড়ো করেছিল। আমার বেশ মনে আছে। ও নিজেও তো ঐ ক্লাশেরই মানুষ, তাই এখন আর কেউ পোঁছে না।"

শ্রীমতী নীরব হয়ে থাকে।

পদ্মা জিগগেস করলেন, "কিছু খেয়েছ তুমি? যা হয় কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড় গে। গোমেশ এ-সব গুছিয়ে রাখবে, ওর অভ্যাস আছে।"

ছুটি শেষ হয়ে এল। পুতুলের বিয়ের তারিখ এগিয়ে আসছে।
পদ্মার তেমন আগ্রহ ছিল না। "তোমার মাকে যারা নিমন্ত্রণ করে না, তাদের বাড়ি যাবার তোমার দরকার আছে কি?"
শ্রীমতী কিন্তু শোনে না, "না মা, আমাকে যেতেই হবে, নইলে তাঁরা দুঃখিত হবেন। তাঁদের মনে আমি কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না।"
"আমার কাছে এতদিন থেকে গেলে একথা জানলে তারা সব কি বলে শুনো! না কি সেখানে গিয়ে আর অভিনেত্রী মায়ের কথা স্বীকারই করবে না?"
শ্রীমতী মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, "পরশু রওনা হব ভাবছি, বিয়ের আর পাঁচদিন বাকি। অনেক রকম কাজ থাকবে। গোপন করা আমার স্বভাব নয় মা, ওঁরা নিশ্চয় জিগগেস করবেন কোথায় ছিলাম। আমিও বলব। তাঁরা যে খুশি হবেন না তা জানি।"
মা সংক্ষেপে বললেন, "বেশ, তাই যেও।" অল্পক্ষণ নীরব থেকে জিগগেস করলেন, "বেলার মেয়েকে কি দেবে?"
শ্রীমতী বললে, "কিনে দেব একটা কিছু ব্যাগ-ট্যাগ।"
মা বললেন, "আমার একটা কথা রাখ, শ্রীমতী, আমি একজোড়া মুক্তোর কানের ফুল দেব, তাই দিও। আমার জিনিসও যা, তোমার জিনিসও তাই। তুমি অস্বীকার করলে বড় দুঃখিত হব।"
শ্রীমতী বলে, "বেশ।"



সকালের দিকে শ্রীমতী বেলামাসির বাড়ি এসে উঠল। "এই তো শ্রীমতীদি! বেশ মেয়ে যা হোক, বলা নেই কওয়া নেই, বেমালুম ডুব মারলে! কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি?" পুতুল শ্রীমতীকে হাত ধরে কাছে বসায়।

বেলামাসি বেশ বাঁকা চোখেই তাকালেন তার দিকে। "যাক, তবু যে এলে সেই ভাগ্যি! একা আমি কোন দিক সামলাই বল তো? এলা তো তার একগুঁয়ে মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত, তার কাছে কি কোনো সাহায্য পাওয়া যায়?"

"এই তো মাসিমা, আমি এসে পড়েছি, বলুন কি করতে হবে? আচ্ছা, টালিগঞ্জ থেকে ওঁরা সব আসেননি? মিলি-মামিমা আর নেলি-ডলি এল না?"

"বিয়ের দিন সবাই আসবে দেখ। কাজের বেলা কারো টিকিটি দেখা যায় না। তবে আমার বৌদি বিয়েটা ঠিক করে দিয়ে মস্ত উপকার করেছেন একথা মানতে হবে। জামাই দস্তুরমতো ভালো ছেলে, হাজার টাকা মাইনে পায়, বালিগঞ্জে নিজেদের বাড়ি আছে, বাপ-মা কেউ নেই! এমন পাত্র কি সব সময় মেলে? এই যে একটা ফর্দ করছিলাম, একটু দেখ তো, কিছু বাদসাদ দিইনি তো? বাপ-মা নেই, কাজেই বরের পক্ষের কোনো চাহিদাই নেই। বর তো আমার মেয়ে পেলেই খুশি! ফর্দে যেগুলিতে দাগ দেওয়া আছে সেগুলি যোগাড় হয়ে গেছে, বাকিগুলো

আজই তুই একবার অতুলের সঙ্গে গিয়ে কিনে দে। তোর মেশোমশাই তো একবার কেনা জিনিসের দিকে পর্যন্ত তাকিয়ে দেখেন না, তা আবার ফর্দ দেখবেন! তাছাড়া চাকরদের তো জামাকাপড় দেওয়া উচিত, রেডি-মেড কিনে আনিস। খাওয়া-দাওয়ার ফর্দটা তোতে-আমাতে আজ রাত্রে বসে করে ফেলব এখন। ভালো করে জলখাবার দেব, পাত পাড়া তো বে-আইনী।"

শ্রীমতীর মনেও বিয়ে-বাড়ির হাসিখুশি প্রবেশ করেছে। হেসে বলল, "পঞ্চাশজনের বেশি জলখাবারও বে-আইনী মাসিমা, তবে মেশোমশাই কি সামান্য আইনকে ডরাবেন?"

মুহূর্তে শ্রীমতী কাজের সাগরে ডুবে গেল।· · ·

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ঘন সবুজ শাড়ি পরে, সবুজ পান্নার মালা দুলিয়ে, দুই কানে ফুলের পাপড়ির মতো দুই সবুজ পাথর পরে, সুটকেশ হাতে মিনিদি এসে উপস্থিত। "ও কি রে শ্রীমতী, তুই বেঁচে আছিস নাকি? শুভেন্দু তোর খবর জানতে চাইছিল, আমি আবার তাকে বলেছি তুই কবে মরে গেছিস।"

শ্রীমতী হেসে ফেলল।

বেলামাসি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "ও কি রকম অলক্ষণে কথা মিনি? শ্রীমতী না-থাকলে এই বিয়ে-বাড়ির কি অবস্থা হত বল তো? তুমি তো বাছা কুটোটি ভাঙবে না।"

মিনি হ্যান্ডব্যাগ থেকে ছোট একটা পাউডার বাক্স বের করে সযত্নে নাকের ডগায় একটু পাউডার লাগিয়ে বলল, "ডার্লিং আণ্ট! কে না জানে কাজ করতে গেলে তোমার-আমার দুজনেরই শরীর খারাপ হয়?"

বেলামাসি বিরস বদনে উঠে গেলেন। শ্রীমতী পুতুলের নতুন তোয়ালে আর বিছানার চাদরে ক্ষুদে-ক্ষুদে অক্ষরে নাম লেখা শেষ করে, সেগুলিকে গুণে ফর্দ করে, বাক্সবন্দী করে ফেলে। মিনিদি সপ্রশংস নয়নে তাকিয়ে থাকে।

"দেখ্, শ্রীমতী, তোকে আমি একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে দেব। তুই কৃতজ্ঞতার পাত্রী হয়ে যাবি।"

কখন শুভেন্দু এসে নীরবে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমতীকে দেখিয়ে মিনি তাকে বলল, "ভুল বলেছিলাম বন্ধু, সে মরেনি।"

শুভেন্দু জিগগেস করল, "তারকা-মহলে কেমন লাগল শ্রীমতী দেবী?"

শ্রীমতী কি বলবে, নীরব হয়ে থাকে। ঘরে এসে শুভেন্দু মিনির পাশে আসন গ্রহণ করল।

"আহা, রহস্যটা খুলেই বল না, শুভেন্দু। শ্রীমতী, ছুটিতে এতদিন তুই কোথায় ছিলি বল তো? নিশ্চয় নীল চিঠির পর থেকে ধাপে-ধাপে তুই সর্বনাশের পথে নামছিস?"

কিন্তু মিনির রঙ্গরসে কারো মুখে হাসি ফুটল না। শ্রীমতী ঠোঁট চেপে বসে আছে, শুভেন্দুর দৃষ্টি গম্ভীর।

কিন্তু বিয়ে-বাড়ির নানান গোলযোগেও চাপা রইল না কথাটা। কৌতূহল কারো কম না। এলামাসি বললেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ শ্রীমতী? পদ্মার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? দেড়বছরের মেয়েকে দিব্যি ফেলে রেখে চলে গেল, কুড়ি বছরের মধ্যে একবার দেখতে এল না পর্যন্ত, এখন তার আবার কিসের দাবী? রমেশকাকাকে কি ভুলে গেলে তুমি?"

শান্ত গলায় শ্রীমতী বলে, "না মাসিমা, মা তো কোনো দাবীর কথা বলেননি। বয়েস হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, আমি ছাড়া তাঁকে দেখবার কে আছে বলুন?"

কথা শুনে বেলামাসি রেগে গেলেন, "পদ্মার স্বভাব কি আর বদলাবে? হাঙ্গামাটুকু এড়িয়ে সুবিধাটুকু বজায় রাখতে চিরকাল ওস্তাদ! তুই কি ভেবেছিস তোর একশো টাকা দিয়ে তুই পদ্মার মতো স্বর্গের পাখি পুষবি? তাছাড়া মিস বিশ্বাস একবার এ্যাক্ট্রেসের নাম শুনলে ক'দিন তোর চাকরি থাকে দেখব!"

শ্রীমতী কোনো প্রতিবাদ করে না। ঘরের কোনা থেকে মিনি ও শুভেন্দু

মনোযোগ দিয়ে কথোপকথন শুনছিল। শুভেন্দুর দৃষ্টিতে বিদ্রুপের ছায়া, মিনি প্রকাশ্যভাবে সন্তুষ্ট।

"বলিহারি তোর মনের জোর শ্রীমতী! আমাকে একবার ঐ পদ্মার কাছে নিয়ে যাবি তো?"

লকেট্-বকেট্ অতুল-পুতুল উৎসাহের সঙ্গে শ্রীমতীর পক্ষ সমর্থন করে। বেশ করেছে গিয়েছে। নিজের মায়ের কাছে আলবৎ যাবে। কেন যাবে না? ইত্যাদি। কেবল শুভেন্দু কোনো মত প্রকাশ করে না।

বিয়ের দিন ছোটদাদামশাই এসেছিলেন চমৎকার এক সেক্সপীয়র-গ্রন্থ উপহার নিয়ে। "দেখ্ পুতুল, এই বইটা মাকে দেখিয়ে নিবি—কোন-কোন নায়িকা ভদ্রসমাজে অচল, আর ঠিক তাদের মতো হতে চেষ্টা করবি।" শ্রীমতীর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কুশলপ্রশ্ন ছাড়া আর কিছু বলেন না।

নির্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হল। লকেট্ শ্রীমতীর কানে-কানে বলল, "আমাকে তোমার মতো হতে শিখিয়ে দাও শ্রীমতীদি। অতনু আমাকে হীরে বসানো আংটি দিয়েছে, কেউ জানে না। পুতুলের বিয়ে দেখে আমার বিষম সাহস বেড়ে যাচ্ছে। দেখো আমার মনেও কত জোর আছে।"

সমালোচনাকে শ্রীমতী ভয় করে না, কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে রূঢ় মন্তব্য খচ করে বুকে লাগে। মুক্তোর কানের ফুল পুতুলকে নির্জনে দিল। পুতুল খুব খুশি, আনন্দের সঙ্গে উপহার নিল, সগর্বে সকলকে দেখাল ঘুরে-ঘুরে।

বেলামাসি বললেন, "নিজের পয়সায় শস্তা কিছু কিনে দিলে ঢের ভালো হত, শ্রীমতী।"

এলামাসি বললেন, "পুতুল তুমিই বা কি বলে নিলে?"

পুতুল মুক্তো দুটি কানে পরে বলল, "বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখ!"

শ্রীমতী ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস বুকে চেপে মৃদু একটু হাসল।

বিবাহের পরদিন চলে গেল পুতুলরা। অতিথিরাও বিদায় নিলেন। এলামাসিরা বাড়ি গেলেন। বেলামাসি শয্যা নিলেন। মিনিদি মন ভালো করবার জন্য পুতুলরা যাবার ঠিক আগে সিনেমা দেখতে চলে গেল। শ্রীমতী একা সেই ভাঙা হাট গুছোতে বসল।

কখন শুভেন্দু কাছে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেনি!

"পুতুলরা চলে গেল একটু আগে, আপনার সঙ্গে দেখা হল না।" তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল শ্রীমতী। শুভেন্দু সেকথার ধারও ঘেঁষল না, নীচু গলায় বলল, "শ্রীমতী, তুমি অভিনয় করবে স্থির করেছ?"

সোজা হয়ে বসে শ্রীমতী বললে, "কে বলেছে?"

"সেটা বড় কথা নয়, কথাটা সত্যি কিনা তাই জিগগেস করছি। অভিনয় করার তুমি কি জানো, বল তো?"

"না জানলে শিখে নেওয়া যায়। অভিনয় করা কি পাপ নাকি? আপনি সিনেমা দেখতে যান না?" কার কথার প্রতিধ্বনির মতো শোনাচ্ছে না? শ্রীমতী সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেল।

"অভিনয় করা পাপ নয়, এবং মাসে আমি অন্তত বার-তিনেক সিনেমা দেখি।" চতুর ব্যারিস্টার শুভেন্দুও মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারছে না, নিরভিমানা শ্রীমতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

"পাপ সেটা নয়, কিন্তু নিজেকে এক্সপ্লয়েটেড হতে দেওয়া পাপ। এরপরেও তুমি আর স্বাধীনতার গর্ব কোরো না কোনোদিন! বোলো না যে তুমি স্বাবলম্বী!"

দরজার কাছ থেকে ছোটদাদামশায় বলেন, "কি জ্বালা! শুভেন্দু, তুমি এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করবে জানলে তোমাকে কখনোই এসব বলতুম না। ভাবলুম, তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বল। এদিকে তুমি এসে—"

ক্ষুণ্নকণ্ঠে শুভেন্দু বললে, "বুঝিয়ে বলার কি আছে? আমি আবার বুঝিয়ে কি বলব?" তারপর নতমুখে ধীরে-ধীরে চলে গেল।



ছুটি শেষ হয়ে গেল। চাঁপাডাঙার ঘন সবুজ নিমগাছের ছায়ার তলায় ফিরে এল শ্রীমতী।

আসবার দিন বাক্স গুছিয়ে, ছোট সবুজ হোল্ডলে বিছানা বেঁধে রেখে, কাউকে কিছু না বলে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। মা লক্ষ-লক্ষ প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, "দেখ শ্রীমতী, ঐরকম একটি বরও কি এত লেখাপড়া শিখে, এত সুযোগ পেয়েও জোটাতে পারলে না? তোমার দৃষ্টি কোথায় থাকে বল তো? এদিকে চলে তো যাচ্ছ, পরেশের সঙ্গে একটা পাকাপাকি কথা বলে গেলে হত না?"

শ্রীমতী বুঝিয়ে বলেছে চাঁপাডাঙায় তার একবছর পূর্ণ হতে এখনো অনেক বাকি, পরেশবাবুর সঙ্গে এখনই কি আর কথা বলা যেতে পারে, ইত্যাদি। তারপর মায়ের শীর্ণ গালে ছোট্ট একটি চুমো খেয়ে সে বিদায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু ছুটি শেষে অন্তরে কিসের এমন শূন্যতা সে বোধ করে! বাড়িঘর ছিল না, আপনার জন ছিল না, মা কোথায়, জানতো না কোনোদিন। সব পেয়েও এত কেন শূন্য লাগে দশদিক সে ভেবে পায় না।

ট্রেন সন্ধ্যাবেলা চাঁপাডাঙা পৌঁছাল।

স্কুলের টিচাররা কেউ-কেউ ফিরেছেন এরই মধ্যে, তাঁদের ঘরে আলো জ্বলছে। মিসেস অধিকারী শ্রীমতীর ঘর খুলে, ধুয়ে-মুছে, আলো জেবলে তারই প্রতীক্ষা করে ছিলেন। বুকের মধ্যে যে হিম তুষার ক'দিন

থেকে জমাট বেঁধেছিল—সহসা গলে তা জল হল। মিসেস অধিকারীর মুখখানি শ্রীমতীর হঠাৎ যেন বড় ভালো লাগল।

"কেমন ছিলেন বলুন। আপনার ফরমায়েস ভুলিনি। ঐ ছোট সুটকেশটা খুলুন, দেখুন কেমন ভালো কাঁচি আর লোমওয়ালা তোয়ালে এনেছি। ওগুলি আপনাকে আমার উপহার।"

কৃতজ্ঞতায় মিসেস অধিকারীর চোখ ছলছল করে উঠল। দুবার কেশে ধরা গলায় অনভ্যস্ত আবেগে শুকনো সেই খরখরে গলায় বললেন, "আচ্ছা, বেশ লোক তো আপনি! নিন, এখন উঠুন, স্নানের ঘরে জল তুলিয়ে রেখেছি, মুখ-হাত ধুয়ে ফেলুন। পরান এখুনি গরম লুচি তরকারি নিয়ে আসবে, আর দেরি করবেন না।"

ট্রেনের কামরায় স্তিমিত আলোতে বসে শ্রীমতী মনে-মনে ভেবেছিল—আমার মন খারাপ, বাড়ি গিয়ে স্নান করে শুয়ে পড়ব। কারো সঙ্গে দেখা করব না, কোনো কাজ করব না, কিছু খাব না। এসে দেখে মিসেস অধিকারী তার মন খারাপ করবার পথটি নিপুণভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। স্নান সেরে ফর্সা কাপড় পরে গরম লুচি তরকারি খেয়ে নিল। মিসেস অধিকারী পাশের চেয়ারে বসে হাসিমুখে বিয়ে-বাড়ির গল্প শুনলেন, নীলনলিনীর নির্বুদ্ধিতার কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করলেন। অনেক রাত্রে তিনি যখন কাঁচি, তোয়ালে গুছিয়ে নিয়ে বিদায় নিলেন ঘুমে শ্রীমতীর চোখ জড়িয়ে এসেছে।

পরদিন সকালে স্কুল খুলল। দলে-দলে মেয়েরা তাদের প্রিয় শ্রীমতীদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, রাশি-রাশি ফুলে ঘর ভরে গেল। কোথাও একটু ফাঁকা রইল না। কিসের অভাব তার? এই তো সুখে বুক ভরে যাচ্ছে। অভাব তার কোনোদিন ছিল না, আজও নেই। তবু তো বছর পুরে গেলে চলে যেতে হবে, রুগ্না মায়ের ভার নিতে হবে গিয়ে। ছোট একটু নিঃশ্বাস পড়ে।

চোখ বুজলেই রমেশ চৌধুরীর মুখখানি ভেসে ওঠে। শাদা আন্দির

পাঞ্জাবী আর মিহি শান্তিপুরী ধুতি পরা, পায়ে লাল বিদ্যাসাগরী চটি, শাদা হয়ে আসা এলোমেলো চুল। কুড়ি বছর ধরে ঐ মানুষটির কত কাছে-কাছে সে থেকেছে। তাঁর প্রতিটি ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কথা সে জানত। সেই পুণ্য সঙ্গলাভ করে কোনোদিনও শ্রীমতী কোনো সঙ্গের অভাব বোধ করেনি। মা নেই, বাবা নেই, ভাইবোন নেই, তবু মনে হয়নি ভালোবাসার লোক নেই।

মনকে বলে আমাকে দিয়ে সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিল না। সুখী মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর ধন ছিল, মান ছিল, বিদ্যার সম্ভার ছিল, কোনো অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু সত্যি কি অভাব ছিল না? স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও কি কোনো অভাব বোধ করেননি? আচ্ছা, মা তাঁকে কি করে ফেলে রেখে চলে গেলেন? দাদাবাবুর কাছে তারা দুজনেই যদি থাকত, তবে কেমন হত? রমেশ চৌধুরীকে আর পদ্মাকে সে একসঙ্গে কল্পনা করতে পারে না।

শুভেন্দুর কথাগুলি স্মরণ করে মনে-মনে তার রাগ হয়। দুঃখিনী মায়ের ভার নিতে চাওয়ার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? শুভেন্দু কি জানে না যে আমার যদি অনেক টাকা থাকত অভিনয় করবার তাহলে প্রয়োজনই হত না। কিন্তু কেমন করে আমি অভিনয় করব? স্কুল-কলেজে মাঝে-মাঝে গোঁফ এঁকে রাম-লক্ষণ সাজা ছাড়া কখনো তো অভিনয় করিনি! মনে পড়ে কি একটা তেলচিটে কালো রঙ দিয়ে গোঁফ আঁকা হত, সাতদিন ধরে সে রঙ ভালো করে উঠতই না।

মিস বিশ্বাস এলেন : "কই মিস্ চৌধুরী, মুখখানি শুকনো কেন? ছুটিতে শরীর ভালো ছিল না বুঝি?"

শ্রীমতী হেসে বলে, "ছিল বই কি। শেষ ক'টা দিন বিয়ে-বাড়ির অনিয়ম গেল। তাই হয়তো অমন দেখাচ্ছে।"

মিস বিশ্বাস একবার তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সংবাদ সংগ্রহ করতে বসলেন। বেলার মেয়ের কোথায় বিয়ে হল, ঘটকালী করে বিয়ে না পছন্দ

করে বিয়ে? এলার মেয়েরই বা কি খবর? এরা সবাই মিলে শ্রীমতীরই বা একটা বিয়ে দেয়নি কেন? সেই সুচতুরা মেয়েটির সঙ্গে সুদর্শন যুবকটির বিয়ে এখনো যদি ঠিক না হয়ে থাকে তবে আর কোনোদিনও স্থির নাও হতে পারে মন্তব্য করলেন অবশেষে।

শ্রীমতী আবার একটু ম্লান হাসল, "আপনি কি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চান মিস বিশ্বাস, যে আমার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন?"

মিস বিশ্বাস তখন অন্য কথা পাড়লেন। এখানকার কাজ শ্রীমতীর ভালো লাগছে তো? কারণ শিগগিরই সেক্রেটারির বাড়ি মিটিং হবে, আসছে বছরের কর্মপন্থতি তৈরি হবে, কে থাকবে কে থাকবে না, নতুন টিচার আনতে হবে কিনা, স্থির হবে সে দিন।

শ্রীমতী নির্বাক। মিস বিশ্বাস বিস্মিত হয়ে তার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝতে চেষ্টা করলেন। "শ্রীমতী, তুমি আমার মেয়ের বয়সী। সত্যি কথা বল দিকিনি, নিশ্চয় তোমার মনে কোনো একটা দুর্ভাবনা আছে। আমি কাল থেকে লক্ষ্য করছি। এস, আমার কাছে এস।"

সহসা শ্রীমতীর মনের বন্ধনগুলি ঢিলে হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে দুই চক্ষু প্লাবিত হয়, দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ড বেয়ে কোলের উপর পড়ে।

মিস বিশ্বাস বললেন, "মনের দুর্ভাবনার কথা বন্ধুজনের কাছে গোপন করা একরকমের স্বার্থপরতা। তুমি সব কথা খুলে বল আমাকে।" নিজেই উঠে এসে কাছে বসলেন তিনি।

সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যাকালে শ্রীমতী জীবনে এই প্রথম তার মনের দ্বার আর কারো কাছে উদ্ঘাটিত করল। রমেশ চৌধুরী ছিলেন তার অন্তর-লোকবাসী, তাঁকে কিছু বলবার কখনো প্রয়োজনই হয়নি। তিনি চলে গেলে আর কাকেই বা সে বলতে পারত?

শুনে মিস বিশ্বাস বহুক্ষণ নীরবে জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শ্রীমতীর এই পরম সমস্যার কে সমাধান করে দেবে?

অনেকক্ষণ পর মিস বিশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার মায়ের শরীর যে সত্যি অত খারাপ তুমি ঠিক জানো? এতদিন তো তাঁর বেশ চলে যাচ্ছিল। তুমি যদি কাছে না-যেতে তবে কি হত? জীবনে এত টাকা তিনি উপার্জন করেছেন, করেছেন কি সে-সব দিয়ে? নামকরা রূপসী অভিনেত্রী, নিশ্চয় তাঁর বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। আমার ধারণা তুমি মনের মধ্যে ব্যাপারটাকে অযথা বড় করে তুলেছ। আমার কিছুই বলা উচিত হয় না জানি, কিন্তু তোমার মা যখন কোনোদিনও তোমার প্রতি নিজের কর্তব্য করেননি, তোমার উপর কোনো দাবীই তাঁর থাকতে পারে না।"

শ্রীমতী ব্যাকুল হয়ে বলে, "না, না, আপনি ভুল বুঝবেন না, মা কোনো দাবী করছেন না। মা তো ইচ্ছে করে আমাকে অনাদর করেননি। প্রথমে অনেক বছর বড় কষ্টে তাঁর দিন গেছে। মতিরাণী বলে এক অভিনেত্রী তখন তাঁকে কত সাহায্য করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মা তখন কি করে একটি ছোট শিশুর ভার নেবেন! আর পরে যখন আমি দাদাবাবুর কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছি তখন আনেননি এই মনে করে যে মা তো আমাকে অত ভালো করে শিক্ষা দিতে পারতেন না। মা আমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছেন। এখন মায়ের শরীর ভেঙে পড়েছে, আর অভিনয় করেন না, টাকাপয়সাও ফুরিয়ে এসেছে, বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধক দেওয়া, এসময় আমার কি কর্তব্য না তাঁর ভার নেওয়া?"

মিস বিশ্বাস কোমল স্বরে বললেন, "তোমার মাকে কি তুমি এখানে তোমার কাছে এনে রাখতে পারবে না, শ্রীমতী? আমি বললে কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো আপত্তি উঠবে না। এখন তো আর অভিনয় করেন না তোমার মা, এখানে তাঁর কথা কেই বা জানে? দেখ শ্রীমতী, আমি খৃস্টান, এসব বিষয়ে আমাদের একটু অন্য ধরনের মতামত, মোট কথা তোমার মা যখন রিটায়ার করেছেন, এখানে চলে আসতে তাঁর কোনো সংকোচের কারণ নেই। তুমি তাঁকে সেকথাই লিখে দাও। এখানকার

জলহাওয়া তো খারাপ নয়, চুপচাপ জায়গা, রুগ্ন মানুষের উপযোগী। তোমার উপার্জনে শাদাসিধেভাবে দুজনের কুলিয়ে যাবে। আর আসছে বছর তোমার মাইনে তো দশটাকা বাড়বে শুনছি।"

চাঁপাডাঙা আসতে মায়ের সংকোচ বোধ হতে পাবে মনে করে শ্রীমতীর ঠোঁটে একটু কৌতুকের হাসি দেখা দিল। মাথা নেড়ে মিস বিশ্বাসকে বলল, "আমার মাকে আপনি দেখলে বুঝতেন এখানে তাঁকে আনা যায় না। তাঁর জগৎ আলাদা। টালিগঞ্জ ছেড়ে এক পা তিনি নড়বেন না। গোমেশ, আয়া, বাহাদুর ছাড়া একদিনও চলবে না তাঁর, এখানে নিয়ে এলে একদিনে হাঁপিয়ে উঠবেন।"

মিস বিশ্বাসের মুখ থেকে সহানুভূতির ছায়া আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল। "তাহলে বল তিনি স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্য তোমাকে অকাতরে বলি দিতে প্রস্তুত আছেন। আর তুমি তবু তারই প্রশ্রয় দেবে? কি জানি শ্রীমতী, আমরা ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি নিজের জীবনের ভালো-মন্দর জন্য নিজেদেরই জবাবদিহি করতে হবে, অন্যে কেন চালাবে আমাকে? কি জন্য?"

শ্রীমতী হতাশকণ্ঠে বললে, "মা আমাকে চালাতে চেষ্টা করবেন কেন? আর কোনো উপায়ে বেশি টাকা রোজগার করা যায় বলে মনে হচ্ছে না, তাই অগত্যা অভিনয় করার কথা ভাবছিলাম।"

মিস বিশ্বাস ব্যথিত চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। "যা ভালো বুঝবে তাই করবে। বাইরের লোক এ-বিষয়ে কে কি বলতে পারে? কিছু মনে কোরো না। ঐ শুভেন্দুও কি এসব কথা জানে? সে কিছু বলেনি?"

শ্রীমতীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। রুদ্ধকণ্ঠে কেবল মাথা নাড়ে, শুভেন্দু জানে সব কথা।

মিস বিশ্বাস বললেন, "আচ্ছা, তবে আসি। আমি আর কি পরামর্শ দিতে পারি তোমাকে?" দরজার কাছে একবার থেমে বললেন, "এ-সব কথা চাপা থাক এখন, কারো সঙ্গে আলোচনা করে কাজ নেই। কমিটি

তোমাকে আসছে বছরের কথা জিগগেস করলে যা ভালো মনে কর সেই কথাই বোলো। চলি আজ।"

গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কি একটা আর্দ্র সুগন্ধে ভরে গেছে ঘর। শ্রীমতী নিশ্চল হয়ে বসে থাকে বহুক্ষণ, নিজের বক্ষের স্পন্দন নিজে যেন শুনতে পায়। সিক্ত চোখের পাতা আপনিই কখন শুকিয়ে গেল। উঠে আলো জেবলে, চোখে-মুখে জল দিয়ে শ্রীমতী বাংলা রচনার খাতা দেখতে বসল। হৃদয়াবেগ বিলাস মাত্র, তার জন্য সময় দেবে এত সময় তার কোথায়? সে-রাত্রিতে শ্রীমতী স্বপ্ন দেখল মিনিদির সঙ্গে শুভেন্দুর বিয়ে হচ্ছে। লাল ওভারকোট পরে, হ্যান্ড-ব্যাগ কোলে, মিনিদি বিয়ের আসনে বসেছে, শুভেন্দুর মাথায় এতো বড় টোপর। চারুশীলা মাসিমার আদেশে পুরুতঠাকুর বুশ-শার্ট গায়ে দিয়ে বসতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীমতী যেন মায়ের কাছ থেকে চেয়ে এনেছে গজমতির মালা, উপহার দিতে হবে!

পরদিন বিকেলের ডাকে পুতুলের চিঠি এল, সে কত সুখী ভাষায় ব্যক্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব, তবে সে যে কোনোরূপে এর যোগ্য নয় একথা সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। দু-তিনদিন হল তাদের চারুশীলা পিসিমা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন, মিনিদিকে শুভেন্দুদা দার্জিলিঙ নিয়ে গিয়েছিল, একদিনের জন্য শেষ দেখা হল না। খবর পেয়ে বেলামাসি আর তাঁর নির্বাক স্বামী দুজনেই দার্জিলিঙ গিয়েছেন। মিনিদি বেচারার ভাই-বোনও কেউ নেই, এবার সে বড়ই একা পড়বে, ইত্যাদি।

খোলা চিঠিখানা পড়ে রইল টেবিলে। শ্রীমতী ভাবতে বসল। এমনি করে একদিন তাহলে মৃত্যু আসে! যে আজ ছোটখাট তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এত চিন্তা করছে বসে, কাল সে কোথায় চলে যায়! দার্জিলিঙের বাড়ি শূন্য হয়ে গেল। পুরোনো চাকরগুলি দুদিন পরে আর কোথাও চলে যাবে হয়তো। চারুশীলাদির কাঠের আলমারিতে থাকে-থাকে শাদা

সিল্কের শাড়ি সাজানো, প্রত্যেকটির সঙ্গে ম্যাচ-করা জামা, রুমাল। আলমারির নিচে দেরাজে সারি-সারি শাদা জুতো, কালো জুতো। গয়নার দেরাজে হীরের আর মুক্তোর আংটি আর মালা। কোনো একটি জিনিসের একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। শাড়ির একটি ভাঁজ তাঁর নষ্ট হত না কখনো। ও-সব নিয়ে মিনিদি আজ কত না বিব্রত হয়ে পড়বে।

এই মুহূর্তে মিনিদির কাছে চলে যেতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, মিনিদি এখন কি করবে? এবার হয়তো শুভেন্দুর সঙ্গে বিয়ে হবে তার। শুভেন্দুর সঙ্গে শ্রীমতীর কি বা সম্বন্ধ? তার মনের কথা বোঝবার জন্য সে এতটুকু চেষ্টা কোনোদিন করল না। তবু কানে বাজে শুভেন্দুর মেঘমন্দ্র স্বর। "আর তুমি স্বাধীনতার গর্ব কোরো না, কোনো দিন বোলো না যে তুমি স্বাবলম্বী।" শ্রীমতী গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

দরজার কাছ থেকে মিস নাগ ও মিস পালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "নতুন খবর শুনেছেন মিস চৌধুরী? আমাদের মিস সেনের যে বিয়ে। এবার স্কুল-বাড়িতে রসুনচৌকি বসবে দেখবেন।"

শ্রীমতী খুশি হয়ে বলে, "বাঃ, খুব সুখবর তো। কার সঙ্গে বিয়ে, কবে বিয়ে? মিস সেন তাহলে চললেন আমাদের ছেড়ে। ওঁকে আমার ভারি ভালো লাগে কিন্তু।"

"আরে সেই কথাই তো বলতে এলাম। কাণ্ডটা একবার শুনুন। বিয়ে হচ্ছে এখানকার ছেলেদের হাইস্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে, তারা আপনাদের মিস বিশ্বাসের মতোই খৃস্টান! বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি-অফিসে, কলকাতায়। তবে এখানে ফিরে এসে নাকি আমাদের একটা ভোজ দেবেন।"

শ্রীমতী মুহূর্তের মধ্যে মিস সেনের বিপুল সুখের এক কণা যেন লাভ করল। "বা, বেশ তো! ওদের বিয়েতে একটি ভালো জিনিস দিতে হবে, তাই না?"

মিস নাগ ও মিস পাল অবাক হয়ে শ্রীমতীর দিকে তাকালেন। "আচ্ছা সত্যি মিস চৌধুরী, আপনি আশ্চর্য লোক। মিস সেন আপনার সঙ্গে এ্যাদ্দিনের মধ্যে ক'টা কথা বলেছে যে তার বিয়ের কথা শুনে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন? তার উপর বিধর্মীর সঙ্গে বিয়ে! কি জানি, আমাদের তো বাপু এসব ভালো লাগে না। শুনেছি এই মিস সেনই একদিন বাপ-মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে, তাঁদের পছন্দ-করা ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপরেই তো এখানে কাজ নিয়ে চলে আসা। এখন সেই বিয়েই তো করলি, অথচ বাড়াবাড়ি তবে করলি কেন?"

শ্রীমতীর হৃদয় তীব্র সূর্যালোকে কোমল ফুলের পাপড়ির মতো সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বাক্স খুলে কলকাতা থেকে আনা নীল রাংতায় মোড়া চকোলেট বের করে সে অতিথি সৎকার করল। বিয়ের বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন উচ্চারণ করতে পারল না।

মিস নাগ ও মিস পাল চলে গেলে পর বারান্দায় কার মৃদু পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আস্তে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলেন মিস সেন, তাঁর চোখ দুটি দূর আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল। মৃদু হেসে দুহাত বাড়িয়ে শ্রীমতীর হাত জড়িয়ে ধরলেন, "আপনি আমাকে অভিনন্দন জানাবেন না মিস চৌধুরী? মিস বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ শুভেচ্ছা জানাল না আমাকে। আপনিও না?"

শ্রীমতী তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল: "কত যে খুশি হয়েছি। মিস্টার বোসের প্রশংসায় মেয়েরা তো পঞ্চমুখ, শুনলাম এখানকার নাইটস্কুলের জন্য কত খাটেন ভদ্রলোক, আর চমৎকার নাকি ফুটবল খেলেন? আচ্ছা, এত কথার এক বর্ণ জানতুম না আমরা! বসুন, একটু মিস্টিমুখ করতে হবে। ঘরে আর কিছু নেই, সামান্য একটু চকোলেট দিতে পারলাম।"

মিস সেন তৃপ্তির হাসি হাসলেন, "কি সুন্দর আপনার এই সবুজ

চেয়ারটা? জানেন, মিস চৌধুরী, নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না। দেখুন কেমন চুনিমণির আংটি দিয়েছেন, উনি তো বড়লোক নন খুব, তাই ছোট আংটি দিয়েছেন, দুনিয়াতে এমন আর একটি খুঁজে বার করুন দেখি।" একটু থেমে, "আমার মা-বাবার মত নেই মিস চৌধুরী, তাঁদের দুঃখ দিতে বিষম কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছিনে। এত কথা কাকে যে বলব একটা লোক খুঁজে পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ আপনার কথা মনে হল। আপনি আমার সমবয়সী, আমার মনের কথা আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। অথচ কাউকে না-বললে দম আটকেই মরে যাব।"

শ্রীমতীও হাসিমুখে বললে, "দেখবেন, আমাদের ভোজটা আগে হয়ে যাক, তার আগেই দম আটকে কাজ নেই!"

হঠাৎ ছায়া পড়ল মিস সেনের মুখে, একটু নীরব থেকে জিগগেস করলেন, "আচ্ছা, মিস চৌধুরী, জীবনে বড় দুঃখ কি বড় সুখ কখনো পেয়েছেন? মানুষ তারপর একটু বদলে যায়, তাই না?"

শ্রীমতী বললে, "কেন বলুন তো?"

"কি জানি, এই আমাকেই দেখুন না, লোকের সঙ্গে ভালো করে মিশতেই পারতাম না, খালি মনে হত কে কোথায় কি মনে করল! আজ আমার সংকোচের বেড়া উড়ে গেছে, দেখুন আপনার কাছে কেমন ছুটে এলাম!"

সেই তৃপ্তিভরা হাসিমুখ দেখে শ্রীমতীর মনে হল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের নিত্য সহচর যে নিদারুণ নৈঃসঙ্গ সে মাঝে-মাঝে পরাজয় স্বীকার করে। শ্রীমতীর মনের ব্যথা লঘু হয়ে গেল। ভাবল, আজকাল আমি ছোট জিনিসকে সত্যি বড় করে দেখতে শুরু করেছি। প্রতিটি দিন যদি নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিনের দাবী নিয়ে এসে উপস্থিত না হত, পৃথিবী কবে একটা বিশাল পাগলাগারদ হয়ে উঠত তাহলে। এরপর ক'দিন ধরেই শ্রীমতীর বারবার মনে হতে লাগল কথাটা।

অনেক ভেবেচিন্তে মিনিদিকে একখানা চিঠি লিখে দিল। ভাবল মিনিদি এখন দুঃখে আচ্ছন্ন, পরে কোনোদিন হয়তো বলবে, "ওরে শ্রীমতী, তোর ব্যবহারেই শক পেয়ে মায়ের এমনটা হল!"

নাঃ, মনে শান্তি নেই। একসঙ্গে অনেকগুলি চিঠি লিখে ফেলল, মাকে, বেলামাসিকে, পুতুলকে। ছুটির শেষে ফিরে আসার আগে মতিরাণী আদর করে মাংসের সিঙাড়া ভেজে এনে খাইয়ে গিয়েছিলেন, ঠিকানা দিয়েছিলেন, বার-বার করে বলে দিয়েছেন চিঠি লিখতে। আজ মনে পড়াতে তাঁকেও চিঠি লিখল একখানি। এর আগেও তো কত সময় তার হাতে থাকত, বালিশের ওয়াড়ে, টেবিলের চাদরে সূক্ষ্ম সেলাই দিয়ে সে ফুল তুলত, তখন কাউকে চিঠি লিখবার প্রয়োজন বোধ করত না। কেউ লিখলে উত্তর দিত এইটুকু মাত্র। আজ আর সেলাই নিয়ে সময় কাটে না।

মতিরাণীকে চিঠি লিখতে বসে ভাবল লিখে দেয়, "মাসিমা, আপনি আমার মায়ের দেখাশুনা করবেন। মায়ের শরীর ভালো না, একা-একা থাকেন, আপনার জন কেউ তাঁর কাছে নেই।" তারপর মনে হল পদ্মাসনার কুঞ্চিত নাসা, তাঁর বিদ্রুপভরা কথা। পদ্মাসনা মতিরাণীকে সত্যি ভারি ঘৃণা করেন। সেই যে বেগুনি শাড়ি পরে, অনিমন্ত্রিত অতিথি হয়েও, ঘর্মাক্ত কলেবরে মতিরাণী পদ্মার বাড়ির পার্টিতে খেটে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর কেউ হলে করত? অনেক ভেবেচিন্তে লিখল, "মাসিমা, এখানে এসে বারবার আপনার কথা মনে পড়ে। আপনার তৈরি সিঙাড়ার স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে। যখনই মনে হয় মায়ের কথা, সেই সঙ্গে মনে হয় আপনার কথা।" ইত্যাদি।

সে চিঠি মতিরাণী বহুদিন বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলেন, বন্ধুদের কাছে গর্ব করে দেখিয়েছিলেন, দেখ পদ্মার মেয়ের সঙ্গে আমার কত ভাব। পদ্মাই না-হয় আজকাল পোঁছে না।

মিনিদির চিঠির উত্তর সে আশা করেনি, কিন্তু তার চিঠিই প্রথমে এল।

শ্রীমতীর চিঠি পেয়ে তার ভালো লেগেছে, সে আশা প্রকাশ করেছে যে শ্রীমতীর মনে মায়ের আচরণে যে ব্যথা লেগেছিল সেটুকু এতদিনে মুছে গেছে। কে জানে, হয়তো শ্রীমতীর আচরণের শক সহ্য করতে না পেরেই মা স্বর্গে গেলেন। এখন মিনিদি কিছুদিন দার্জিলিঙের বাড়িতে থাকবে। শুভেন্দু চার-পাঁচদিন থেকেই চলে গিয়েছে। বেলামাসিরা আছেন আরো কিছুদিন। শ্রীমতী যেন এখুনি কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে, কারণ সময়মতো চা-টা পাওয়া যায় না ইত্যাদি।

এর মধ্যে এক রবিবার লকেট্-বকেট্ এসে উপস্থিত। শ্রীমতী তখুনি তাদের নিয়ে মিস বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করিয়ে আনল। মিস বিশ্বাস হাসিমুখেই তাদের সমাদর করলেন, শ্রীমতীকেও দুটি কথা বললেন, কিন্তু মনের কথা দুজনের আর কখনো হল না।

সাগ্রহে মিসেস অধিকারী লকেট্-বকেটের খাবার আয়োজন করতে লাগলেন, শ্রীমতীর আর কোনো কাজ রইল না। লকেট্-বকেটকে ঘরে এনে বসাল, সোজাসুজি জিগগেস করল, "আমাকে দেখতে এসেছ না আর কোনো উদ্দেশ্য আছে?"

বকেট্ বললে, "আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। লকেটের উদ্দেশ্য আছে।"

লকেট্ বললে, "আমার একুশ বছর পূর্ণ হল, শ্রীমতীদি। এখন আমি সাবালিকা।"

হেসে ফেলল শ্রীমতী, "সাবালিকা হয়েছ, তা এখন আমাদের কি করতে হবে?"

লকেট্ কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে বলল, "আহা, কিছু বোঝ না যেন! জানো এখন আমি ইচ্ছা করলেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করতে পারি।"

শ্রীমতী বললে, "লকেট্, এত তাড়াতাড়ি কিসের ভাই! এমন করে পাওয়ার মতো যে জিনিস আর একটু না-হয় প্রতীক্ষা করলে তার জন্য! দুটো দিন সময় দাও না, বি. এ. পরীক্ষাটা সামনে, পরীক্ষাটা হয়ে যাক,

সেটুকু অপেক্ষা করতে পারবেই। তারপরও যদি এলামাসির মত না হয়, তখন না-হয় যা করতে হয় কোরো।"

বকেট্ আড়চোখে একবার লকেট্‌কে দেখে নিয়ে শ্রীমতীকে বললে, "তুমি তো মিথ্যা কথাকে ঘৃণা কর, কিন্তু আমরা আজ কি বলে তোমার এখানে এসেছি জানো? বলেছি তোমার এখানে চায়ের পার্টি, তুমি চিঠি লিখেছ, সে-চিঠি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। নইলে মা-ও হয়তো সঙ্গে এসে উপস্থিত হতেন, ব্যস, লকেটের গূস কুক্‌ড্! তাছাড়া, আমার একটা পরামর্শও আছে, তুমি সামনে ছিলে না তাই সাহস করে বলতে পারছিলাম না। মাকে এড়িয়ে সোজা বাবার কাছে আপীল করলে কেমন হয়?"

শ্রীমতী উৎসাহিত হয়ে উঠল, "ঠিক বলেছ! মেসোমশাইকে দলে টানো! লকেট্ তুমি গিয়ে বলতে পারবে না?"

লকেট্ বললে, "বাবা কখনো কোনো কিছুতে থাকেন না, তাই তাঁকে কিছু বলবার সাহসই হয়নি। তবে মা কি আর নিজের দিকটা বলেননি তাঁকে। তবু একবার বলতে পারি, বলেছি তো আজকাল আমার ভারি সাহস হয়েছে।"

বকেট্ খুশি হয়ে বললে, "হবেই তো, অত টোমাটো সস খেলে সাহস বাড়বে না? আমার মনে হয় বাবা খুব রিজনেবল্ লোক, তাছাড়া কে না জানে পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে সব বিষয়েই ভালো হয়।"

শ্রীমতী বললে, "হয়ই তো ভালো।"

লকেট্ বললে, "ঢের ভালো, ঢের ঢের ভালো।"

সমস্যা সমাধান করে তিনজনে বাকি দিনটুকু মনের আনন্দে কাটাল। মিসেস অধিকারী কত কি যে তৈরি করে পাঠালেন! বকেট্ বলল, "এতদিনে বোঝা গেল শ্রীমতীদি কেন চাঁপাডাঙা ছেড়ে নড়ে না, এত সব যোগাবে কে?"

বিকেলের গাড়িতে ওরা চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা শ্রীমতীর মন আনন্দে

কানায়-কানায় ভরা সেদিন। মিস সেন এসে খানিকক্ষণ গল্প করে গেলেন। তাঁর জন্য নতুন-নতুন জামা সেলাই করে দিচ্ছে সে, মিস সেনের আহ্লাদ আর ধরে না। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। সলজ্জভাবে বললেন, "মিস্টার বোসের বাড়ি চুনকাম হচ্ছে, দরজা-জানলায় নতুন রঙ লাগানো হচ্ছে। সুন্দর বাগান আছে বাড়িতে, কত বিলিতী ফুলের গাছ আছে। আগে ওখানে মিশনারী সাহেবরা থাকত, কি সুন্দর বাগানই করেছিল তারা।" মিস সেন অনর্গল বকে যান, শ্রীমতী মনোযোগ দিয়ে শোনে। বিয়ের পরও মিস সেন পড়াতে আসবেন বলেছেন। মিস্টার বোস তো দশটা থেকে চারটে কাজে ডুবে থাকেন, মেয়েদের স্কুল বসে সাড়ে দশটায়, সাড়ে-তিনটেতে ছুটি, কোনো অসুবিধা হবে না।

কিসে মানুষ সুখী হয় কে বা জানে। মায়ের ক্লিষ্ট রূপের কথা মনে পড়ে শ্রীমতীর। জীবনে একদিনের জন্যও সুখী হতে পারেননি বোধ করি। সুখী হবার একটা যদি কোনো ধরাবাঁধা উপায় থাকত, কত সহজ হত জীবন, পদ্মাকে তাহলে শ্রীমতী এখুনি সুখী করে দিত। কিন্তু পদ্মাকে সুখী করতে হলে এই স্কুলের কাজ ছেড়ে তাকে টালিগঞ্জের সেই ছোট হলদে বাড়িতে উঠে যেতে হবে। পরেশ নাগের সুপারিশে কোনো একটা ভালো স্টুডিওতে অনেক উজ্জ্বল আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হবে। সে কি পারবে? হয়তো পারবে না। পরেশ নাগ হতাশ হবেন, পদ্মা অসন্তুষ্ট। না, শিখতে হবে অভিনয়, শিখতে হবে সাজসজ্জা, শিখতে হবে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা। কিন্তু তাতেও যদি সুখী না হন পদ্মা! তাহলে?

কিন্তু চেষ্টা সে করবেই। তার মানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ওই হলদে বাড়িতে লেসের পর্দার আড়ালে, গোমেশের উৎকৃষ্ট রান্না খেয়ে তবে মাকে সুখী করতে হবে। নিমগাছের ছায়াচ্ছন্ন শান্তস্নিগ্ধ এই দিনগুলিকে মনে হবে স্বপ্ন। মিস বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরটি স্মৃতি থেকে মুছে যাবে, মিস সেনের মুখখানি আর তার মনে থাকবে

না, মিসেস অধিকারীর যত্ন থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকতে হবে। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে মেয়েরা আর ডাকবে না, "শ্রীমতীদি, ঘরে আসব?"

শ্রীমতীর হাসি পেল ভেবে, আমি কি পাগল হলাম! কাজ ছেড়ে দেব বলে দুঃখ না করে, এর সঙ্গে দেখা হবে না, ওর কথা শোনা হবে না বলে আক্ষেপ করতে বসেছি! কাজ কি কখনো কারো জন্য পড়ে থাকে? যে-কাজের চাকা হাতে করে তারও মৃত্যু আছে, কিন্তু কোনো কাজই তাই বলে থেমে থাকে না। এ-জগতে এমন কেউ নেই যে অপরিহার্য। পরলোক বলে কিছু আছে কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কি? এদিকে এ-পৃথিবীরও আমাদের দিয়ে সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন নেই! আশ্চর্য!

প্রয়োজন কাউকে দিয়ে নেই?

রমেশ চৌধুরীর পুরোনো একটা কথা মনে পড়ল। শ্রীমতী যদি কখনো কাজের অছিলা করে কোথাও বেরুতে না চাইত অমনি বলেছেন, "ওরে, তোকে ছাড়াও কাজ চলবে রে। যীশু মরে গেল, মহম্মদ মরে গেল, রামচন্দ্র মরে গেল, বিবেকানন্দ মরে গেল, তবু পৃথিবীটা দিব্যি চলল, আর তুই একদিন বাড়ি না-থাকলে সংসারটা ঠেকে থাকবে, তাও কি কখনো হয়?"

ভাবল তাহলে শুভেন্দুকে দিয়েও পৃথিবীর কোনো প্রয়োজন নেই। শুভেন্দু না-জন্মালেও কোনো ক্ষতি হত না! শুভেন্দুর নবদুর্বাদলের মতো স্নিগ্ধ শ্যাম-শোভন রূপেরও কোনো মূল্য নেই! শুভেন্দুর মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর থেমে গেলেও ক্ষতি নেই কোনো! শুভেন্দুর ধনুকের মতো ভ্রূযুগলের নিচে নীলোৎপল দুই চোখের দীপ্তি নিস্প্রভ হলে এসে যায় না কিছু! শুভেন্দুর বজ্রের মতো কঠিন, কুসুমের মতো কোমল, হৃদয়ের স্পন্দন থেমে গেলেও সংসার চলবে!

কি আশ্চর্য! তবু সংসার চলবে! যে শুভেন্দুর দেহ ধারণ করেছে বলে পৃথিবীটা আজ তার চোখে অর্থময় সে না-থাকলেও কিছু ক্ষতি হত

না! সূর্যের আলো ম্লান হত না, দক্ষিণ বাতাস স্তব্ধ হত না, ঘন সবুজ বনানীর অন্তরাল থেকে মর্মরধ্বনি নীরব হত না! তবু দিন হত, জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতো রাত, পাখিরা গান গাইত, গাছে ফুল ফুটত, ভ্রমর গুঞ্জন করত! কোনো কাজ বন্ধ হত না, কোনো অভিপ্রায় ব্যর্থ হত না!

হায় কেন আমি তাকে ভালোবাসি! মিস সেন ডাকলেন, "শ্রীমতী! কি মিষ্টি তোমার নামটি! আর আপনি বলব না তোমাকে, আর 'মিস চৌধুরী' বলে ডাকব না। তুমি যে আমার বন্ধু! যখন আনন্দ হয় ভাবি শ্রীমতীকে গিয়ে বলে আসি। যখন দুঃখ হয় ভাবি শ্রীমতীকে জানাতে হবে। ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে শ্রীমতী, ভাগ্যিস তুমি ভুল করে আর কোথাও, অন্য কোনো দেশে জন্মাওনি। যদি জন্মাতে বিলেতে, বা আফ্রিকায়, তাহলে? যদি একশো বছর আগে বা একশো বছর পরে জন্মাতে কি সর্বনাশটাই হত বল তো! তুমিও আমাকে ললিতা বলে ডেক, কেমন?"

শ্রীমতী হেসে বলল, "মিস্টার বোস বুঝি তোমাকে তাই বলে ডাকেন? আচ্ছা, আমিও না-হয় তাই বলব।"

ললিতার কথা ফুরোয় না। হেসে বলে, "কি আর করা! নিজের বাসন-কোসন নিজেই কিনছি দেখেশুনে! ও-বাড়ির হালচাল যদি দেখ ভাই! সুরেন বলে একটি পুরোনো চাকর আছেন, তিনিই বাড়ির গিন্নী! কোনো দুটো পেয়ালা বা প্লেট একরকম নয়। রান্নাঘরের প্রত্যেকটা বাসন তোবড়ানো, কালো, বিশ্রী! খুন্তি নেই, সাঁড়াশী নেই, ভাবতে পার? বাসন মোছা ন্যাকড়াগুলির যা ছিরি! আমি ভাই সব খুঁটিয়ে দেখে এসেছি, ভদ্রলোক যখন কাজে বেরিয়ে গেছেন, তা তোমরা মন্দ বল আর যাই কর। কি কিনতে হবে না হবে আমার তো জানা দরকার।"

শুনে সত্যি খুশি হল শ্রীমতী। এতো তার মনের মতো কথা। বলে, "বেশ, আমি তোমাকে কি উপহার দেব ভেবে মরছি। তা একসেট ডেকচি

দিলেই তো হয়। তাই না? পাঁচটা ডেকচি থাকবে—ভাত রাঁধা থেকে ডিম সেদ্ধ সবই চলবে তাতে। কিন্তু মিস্টার বোস ভোজ না-খাওয়ালে কিছু পাবে না।"

ললিতা বারবার অঙ্গীকার করে, নিশ্চয় মিস্টার বোস ভোজ খাওয়াবে। খাওয়াবে না তো কি!

সে চলে গেলে শ্রীমতীর মনে হয় এই আমি কত ভেবে স্থির করলাম জীবনটার কোনো মানেই হয় না, সংসারটা কিছু নয়, আবার এই আমি মহা খুশি হয়ে ললিতা সেনের সংসার পাতার সাহায্য করতে যাচ্ছি! আশ্চর্য!

•

আকাশে বর্ষার মেঘ জমা হচ্ছে। রোজ বৃষ্টি হয়। সেই অনিবার বারি-বিন্দুপাতে শ্রীমতীর হৃদয়ে এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত হতে থাকে। মনে হয় চারদিকের এই প্রকাণ্ড বিশ্বজগৎ পড়ে আছে, কারো সঙ্গে তার অন্তরের কোনো যোগাযোগ নেই। নিজের অন্তর তারই একান্ত আপনার। মা আছে, বন্ধু আছে. ভালোবাসার লোকও আছে, কিন্তু শ্রীমতী তাদের কে?



শ্রীমতী ভেবেছিল শুধু কাজ দিয়ে বুঝি মনটাকে ভরে রাখা যায়। কাজের বেলায় দেখল তাতে ফাঁক ভরে না। তবু নিজের চারদিকে একটা সজীব কাজের পরিবেশ সে সৃষ্টি করে তুলেছে। সকালে খাতা দেখা, স্নান খাওয়া; সারাদিন পড়ানো। বিকেলে গা ধুয়ে, চা খেয়ে আজকাল আর বেরোনো যায় না, একটানা বর্ষা চলছে। ঘরে বসে সে তখন ললিতা সেনের নতুন রেশমী জামাতে নিখুঁত করে ফুল তোলে। মাঝে-মাঝে সুতো ফুরিয়ে গেলে ছাতা মাথায় বেরোতেই হয়। স্টেশনের পিছনে ছোট্ট মনিহারি দোকান, সেখান থেকে রঙ মিলিয়ে সুতো কিনে আনে।

"আপনার সেই ঘোর লাল রঙটা কবে আনিয়ে রেখেছি, তা দিদিমণি আর আসেনই না।" দোকানী পরিচিত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

"যা বৃষ্টি ব্রজলাল। বেরোবার জো কি আছে? কই দেখি তোমার সুতোর বাক্স। আমার ডেকচির সেট এনেছ?"

ব্রজলাল সগর্বে এনে দেখাল ঝকঝকে ডেকচির ভিতরে ডেকচি বসানো, পুরো একটা সেট। ব্রাউন কাগজে মুড়ে রেখেছে।

"আমিই পৌঁছে দেব দিদিমণি মাস্টারবাবুর বাড়িতে, বিয়ের পর যেদিন ফিরে আসবেন সেদিন হলেই তো হবে? আহা মাস্টারবাবু বড় ভালো লোক, ওরকম সচরাচর দেখা যায় না।" ব্রজলালের মুখেও প্রশংসা ধরে না।

সুতো বেছে নিয়ে শ্রীমতী বলল, "এই সুতো চারটে নিলাম। আর

সত্যিই ডেকচি তুমি পৌঁছে দিলে আমারও সুবিধা হবে। সঙ্গে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব, সেটি নিতে ভুলো না কিন্তু। ললিতা আমার বন্ধু কিনা।"

ললিতা আমার বন্ধু। 'বন্ধু' বলতে শ্রীমতীর বুক যেন সুখে ভরে গেল। বন্ধুর মতো কি বা আছে জগতে? আত্মীয়স্বজনরা না চাইতেই থাকে, চেষ্টা করে তাদের লাভ করতে হয় না, কিন্তু বন্ধুদের যোগাড় করে নিতে হয়, তাদের হৃদয় জয় করতে হয়। ললিতা আমার বোন হলে তাকে পেতে আমার কোনো কৃতিত্বের প্রয়োজন হত না, সে এমনি আমার জীবনে জুটে যেত। মনে হত না তাকে পাওয়ার মধ্যে এত তৃপ্তি থাকতে পারে।

আপন মনে সবুজ পাতার নক্সা তোলে শ্রীমতী, মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে। শুভেন্দুর কথা ভাবছিল। শুভেন্দু ইচ্ছে করে ভুল বুঝল তাকে। এদিকে সপ্তাহে তিনবার চিঠি আসে নীল পুরু খামে, ঈষৎ গোলাপ-গন্ধ মাখা। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা লেখেন পদ্মাসনা। 'আমার শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না। তোমার বছর কবে শেষ হবে তারই আশায় বেঁচে আছি। পরেশ খুব ভালো সুযোগ দেবে তোমাকে। মা থাকতে তোমার কোনো ভাবনা নেই!'

শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে ললিতা সেনের বিয়ে হয়ে গেল, কলকাতায় এক রেজিস্ট্রি অফিসে। শ্রীমতীর ছুটি নেই, সঙ্গে যেতে পারল না। তার বদলে ললিতার বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে দিল, সঙ্গে যাবে যে ছোট সুটকেশ সেটিও। "কি মেয়ে রে তুই ললিতা! এত সাবান, তেল, ক্রীম, পাউডার, এসেন্স দিয়ে করবি কি? মিস্টার বোস বেচারীর মাথা ঘুরিয়ে দিবি দেখছি! ভদ্রলোক ছেলে ঠেঙিয়ে জীবন কাটান!"

কৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ বড় করে ললিতা জবাব দেয়, "কি বলিস!

ও তো কিছুই নয়, ওটুকু লাগবে না? তুই যেন কি? পাউডারও মাখিস না বোধ করি তুই?"

শেষ মুহূর্তে ললিতার সঙ্গে মিস বিশ্বাস নিজেই গেলেন কলকাতায়। পড়ে রইল তাঁর সারাদিনের সহস্র কাজ। কোথাও একটু ত্রুটি নেই তাঁর কাজে। যদি ওঁর মতো একটুখানিও হতে পারতাম! শ্রীমতী ছোট্ট একটু নিঃশ্বাস ফেলল।

পুতুলের গুছনো বিয়ের কথা মনে পড়ল। কত সুখী হয়েছে পুতুল। ললিতাও হবে, নিশ্চয়ই হবে। মিস্টার বোসের মতো লোক হয় না, সবাই তো একথা বলে। কেন তারা সুখী হবে না? বাধা দিয়ে ললিতার বাবা-মা অন্যায় করেছেন। যেমন অন্যায় করছেন এলামাসিও। বাবা-মা'দের ভালোবাসা কি গভীর, কিন্তু সময়ে-সময়ে কি সাংঘাতিক।

বাইরে তাকিয়ে দেখল শ্রাবণ শেষে শরৎকাল কখন নিঃশব্দ চরণে এসে আমবাগানকে অধিকার করেছে। গাছের পাতায়-পাতায় ও কিসের শিহরণ, শ্রীমতী এতদিন লক্ষ্য করেনি!

মিস্টার বোসের বাড়ি গিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করে বিয়ের ভোজ খেয়ে এল। ললিতা তাদের আদর করে বসাল, তার চোখ দুটি তারার মতো উজ্জ্বল। মিস্টার বোসের দীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, সুগঠিত দেহে স্বাস্থ্যের আভা লেগে আছে। মৃদু হাসি নিয়ে তাদের কত আপ্যায়ন করলেন ভদ্রলোক। মিস পাল আর মিস নাগও গিয়েছিলেন। বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে শতমুখে প্রশংসা করলেন তাঁরাও। অনেক রাত্রে মিস্টার বোস কোথা থেকে তিনখানা ঘোড়ারগাড়ি জুটিয়ে এনে তাদের পৌঁছে দিলেন।

ক্লান্ত দেহ আর প্রসন্ন মন নিয়ে শ্রীমতী সে-রাত্রে শুয়ে পড়ল। মনে-মনে বার বার বলল ওরা সুখী হোক, ওরা সুখী হোক, ওরা সুখী হোক। কিন্তু চোখে আর ঘুম আসে না। ঘুরে ফিরে উৎসব-বাড়ির কথা মনে

পড়ে। মিস্টার বোসের মা-বোনরা সত্যি উদার। আদর করে ললিতাকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ললিতার মা-বাবা একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখেননি। সন্ধ্যাবেলা ললিতার সতেরো বছরের ছোট ভাইটি চুপিচুপি কয়েকঘণ্টার জন্য এসেছিল। মিস্টার বোস দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। শ্রীমতী লক্ষ্য করেছিল কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখ দুটি সেই মুহূর্তে। তারপর রাত্রের ট্রেনে চলে গেল ছেলেটি, কিন্তু ললিতার চিত্তে কোথাও যদি একটুখানি ব্যথা লুকিয়ে থাকবার স্থান থাকে, সেটুকুও কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল।

শ্রীমতী মনকে বোঝাল রাগ পুষে রাখতে নেই, দুঃখকে আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। উঠে পড়ে আলো জেবলে শুভেন্দুকে একখানা চিঠি লিখতে বসল।

প্রীতিভাজনেষু, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। ভুলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না, সেইজন্য এই চিঠি। অভিনয় করবার আমার কোনো শখ নেই। অভিনয় করতে কেউ আমাকে জোর করেনি। তবে কেন করব? তুমি আমার রুগ্ন মায়ের কথা জানো, তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করতে হলে যা-যা করা আমার প্রয়োজন আমাকে সমস্তই করতে হবে। আমার একশো টাকা মাইনের চাকরিতে কুলোবে না। কেন তুমি এক্সপ্লয়টেসনের কথা তুললে? আমার যে কত দুঃখ হয়েছে বলতে পারি না। আশা করি ভালো আছ। ইতি—

ছোট একখানি শুষ্ক চিঠি। মধুর কথা কতোই হয়তো বলা যায়, শ্রীমতীর তার একটিও মনে পড়ল না। খাম বন্ধ করে, ওপরে ঠিকানা লিখল কলকাতার। সেখানে সে আছে কিনা, পৌঁছবে কিনা এ-চিঠি তার হাতে, কে জানে। কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যেতে পারে।

পরদিন কমিটি মিটিং। তার আগে মিস বিশ্বাস একবার এলেন। শ্রীমতী

বসবার জায়গা দিতে যাচ্ছিল, তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "একটুও সময় নেই, মিস চৌধুরী। আমি মিটিংএর কথা জিগগেস করতে এসেছিলাম। আপনি তাহলে সত্যিই আসছে বছর আর থাকবেন না? মন ঠিক করে ফেলেছেন?"

শ্রীমতী নিচু গলায় বললে, "আমার থাকবার কোনো উপায় নেই, মিস বিশ্বাস। আমি ইচ্ছে করে চলে যাচ্ছি না।"

ললিতা চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিল, আর সময় নষ্ট করার জো নেই, অন্যমনস্কভাবে শ্রীমতী প্রস্তুত হতে গেল। মাঝপথে মিস পাল আর মিস নাগের সঙ্গে দেখা।

"বেশ আছেন মিস চৌধুরী! রোজ নেমন্তন্ন! কই আমাদের যে বড় ডাকে না!"

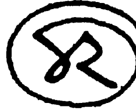
শ্রীমতী হেসে বলে, "আমি নিশ্চয় তাহলে আপনাদের চেয়ে ভালো, তাই বেশি ডাকে।"

মিস পাল বললেন, "আপনার বন্ধু সেই জমিদার বাড়ির মাথা-পাগলা বৌয়ের কাণ্ডখানা শুনেছেন? কাল রাত্রে সে ট্রেনে চেপে পালাবার চেষ্টায় ছিল। কি সাহস বলুন তো? একবর্ণ লেখাপড়া জানে না, হাতে মাত্র একটি টাকা, কতখানি বুকের পাটা বলুন!"

শ্রীমতী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। "কি হল বেচারীর?"

"কি আর হবে? তার স্বামী দেখতে পেয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে এনেছেন। ও নাকি মহা কান্নাকাটি করেছে! এখন মন গলেছে স্বামীর, ওকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছেন, নাকি লেখাপড়া শেখাবেন! আমি হলে অমন স্বামীর মুখ দেখতাম না।"

শ্রীমতী কোনো উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু মনটা আবার তার খুশি হয়ে ওঠে।



আরও কাটল কিছুদিন। শুভেন্দু সে চিঠির উত্তর দেয়নি, পেল কি পেল না তাও বোঝা গেল না।

তবে লকেট্ লিখেছে। বাবাকে বকেট্ই বলেছে সব কথা, তবু শেষ মুহূর্তে লকেটের একটু কেমন যেন, ঠিক ভয় নয়, তবে নার্ভাস লাগছিল। বাবা বলেছেন, "এত কথা আগে বলিসনি কেন? ডাক ওকে।" বকেট্ লকেট্কে ডেকে আনে। বাবা অবাক হয়ে বলেন, "আহা ওকে কেন? ও না পরীক্ষার পড়া করছে, কিছু খায় না, কোথাও যায় না। সেই ছোকরাকে ডেকে আনতে বলছিলাম।" লাফাতে-লাফাতে তখুনি কোথা থেকে যেন অতনুকে ধরে নিয়ে এল বকেট্। বাবা তাকে সামনে বসিয়ে হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে, তার বয়স, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, চাকরি, মাইনে ও সিগারেটটা না-খাওয়ার কারণ কি জানতে চাইলেন। অতনু বললে, "ও আমি খাই না।" শেষ পর্যন্ত বাবা বলেছেন, এপ্রিল মাসে পরীক্ষা, জুন মাসে বিয়ে। মা এতক্ষণ একেবারে নীরব। তবে রাগ করেননি কারণ রাত্রে এসে অনেক আদর করে গেছেন।

ভালোই হল। এলামাসির মনেও এবার শান্তি হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমাদের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এসব অনেক সময়ে তো প্রকৃত নয়ই, রাগগুলোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। আপত্তিগুলির ওপর পর্যন্ত নির্ভর করা যায় না। আমার অনুভূতি বোধহয় তেমন গভীর নয়, তাই সহজে বিচলিত হই না আমি। রাগে অন্ধও হই না, আহ্লাদে গলেও

যাই না। ছোটবেলায় মা, বাবা, ভাই-বোন কাউকে পাইনি তাই কি এমনটি হলাম? মনে পড়ে রমেশ চৌধুরীর কোমল কৌতুকময় মুখখানি, পুরোনো চাকর-দাসীদের সেবা। সগর্বে মুখ তুলে জানলা দিয়ে অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিরেখার দিকে তাকিয়ে ভাবে, কোনো দিনও আমার কোনো অভাব ছিল না, এতদিন পরে কি আমার অভাবের কথা মনে করবার সময় হল?

মিসেস অধিকারী দশটা টাকা ধার করতে এলেন। শীর্ণ দুই গালে তখনো চোখের জলের দাগ রয়েছে। কথা বলতে ঠোঁট কাঁপছে তখনো। শ্রীমতী তখুনি তাঁকে দশ টাকা দিয়ে জিগগেস করল, "কোনো বিপদ ঘটেছে, মিসেস অধিকারী? আমি কি কিছু করতে পারি?"

মিসেস অধিকারী মাথা নাড়লেন। চলে যাওয়ার উপক্রম করে কি মনে করে ফিরে এসে শ্রীমতীর আরাম চেয়ারে বসেই পড়লেন। মিনিট দুই চুপ করে থেকে বললেন, "বলুন তো মিস চৌধুরী, দুষ্টু লোককে ক্ষমা করলে কি অন্যায় হয়? অনুতপ্ত দুষ্টু লোক নয়, বিপদে পড়েছে এমন দুষ্টু লোক?"

শ্রীমতী তাঁর পাশে বসে আস্তে আস্তে বলল, "আপনার ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে?"

মিসেস অধিকারী চোখ মুছলেন: "অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, শ্বশুর-বাড়ির লোকের কাছে তেমন প্রিয়ও হতে পারিনি। আমার স্বামী আমাকে গোড়াতে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেন, কিন্তু পরে আমাকে আর ভালো লাগত না। আমিও চুপ করে থাকবার মেয়ে ছিলাম না। ভীষণ ঝগড়াঝাঁটি হত। শেষটা চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিধবা বড় ননদেরই অনেকটা কারসাজি। কতদিন হল চলে এসেছি! ভাইরা আশ্রয় দিলে না, কত দুঃখে দিন কাটিয়েছি। বন্ধুর মধ্যে ঐ আমার সমবয়সী ভাইঝি নীলনলিনী আছে। কেমন যেন বন্ধুত্ব পাতাতেই জানিনা আমি। আজ আবার দুমাস থেকে ঐ বড় ননদ চিঠি লিখেছেন,

আমার স্বামী আজকাল তাঁকেও টাকাপয়সা দেন না, বয়েস হয়ে গেছে নিজেও কিছু করতে পারেন না, খাওয়া-পরা চলে না। কি করি, কিছু-কিছু করে টাকা পাঠাচ্ছি। আমারই দিন চলা দায়, ওদিকে লাইফ ইনসিওরের টাকাটাও না দিলেই নয়, শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে হাত পাততে হল। তবে আর মাত্র তিনটে কিস্তি দিতে হবে, তারপর একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা পেয়ে যাব। ভাবছি এখানে একখানা ছোট্ট ঘর করে ননদকে এনে রাখব। আমারও তো বয়েস হয়ে যাচ্ছে, কারো জন্য কিছুই করতে পারলাম না। ওকে এখানে এনে রাখলে কেমন হয়?"

শ্রীমতী বলে "বেশ তো এনে রাখবেন, কিন্তু খরচ চালাতে পারবেন তো?"

মিসেস অধিকারী বললেন, "আমার ননদ চমৎকার ক্রুশের কাজ, ছুঁচের কাজ জানেন। মিস বিশ্বাস বলছিলেন এখানে একটা কাজ ঠিক করে দিতে পারবেন। তাহলেই চলে যাবে দুজনের। সারা জীবনটাই ভাই বোর্ডিংএ কাটালাম, নিজের একটা বাড়ির শখ মাঝে-মাঝে হয়।"

শ্রীমতী অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভাবে, কি আশ্চর্য মানুষ মিস বিশ্বাস, ঠিক যেখানটিতে দরকার সেইখানেই আছেন। ভাগ্যিস এখানে কাজ নিয়ে এসেছিলাম নইলে তো দেখতে পেতাম না।

মিসেস অধিকারী উঠে পড়লেন। "মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল মিস চৌধুরী, কেন জানি পুরোনো কথাগুলি একটি-একটি করে মনে পড়ছিল। একবার ভালোবেসে কেউ যদি দূরে সরে যায় তার মতো দুঃখ আর এজগতে নেই। জানেন, বিয়ের পর প্রথম রোজ—যাকগে, কেন যে ভাবি ওসব কথা।"

মিসেস অধিকারী চলে গেলে শ্রীমতীর মনে হয় এই জীবনটা একখানি ছায়াচিত্র, শ্রীমতী তার দর্শকমাত্র। ছবির মানুষদের সুখদুঃখে হেসে-কেঁদে আকুল হই, কিন্তু ওরা আমার কে? কার সঙ্গে আমার কি বা সম্বন্ধ? মায়ের সঙ্গেই বা কি? যদি ঐ মা না হয়ে, আর কেউ অন্য

রকমের চেহারা নিয়ে তার সামনে দাঁড়াত এসে, বলত, "ওরে আমিই তোর মা, আমিই তোকে পেটে ধরেছিলাম, আমার জন্য কি করবি বল?" শ্রীমতী তখুনি বলত, "মাগো, আমি তোমার সেবা করব, তোমাকে সুখী করতে চেষ্টা করব।" সে তার মা-মানুষটিকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে মা-চিন্তাটিকে। মাকে ভালোবাসা কর্তব্য, তাই বুঝি তার মনে হয় মাকে ভালোবাসি। একদিন সে রমেশ চৌধুরীকে ভালোবাসত। তিনি মরে গেলে, আর কাউকে বাসে না। কারো সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ নেই। সে একলা এসেছিল, একলা যাবে। হৃদয়ের নৈঃসঙ্গ তার কেউ ঘুচাতে পারবে না।

পরদিন বিকেলে পরেশ নাগের টেলিগ্রাম এল, শ্রীমতীর মায়ের স্ট্রোক হয়েছে, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র সে যেন চলে আসে। নীরবে সুটকেশ গুছিয়ে, স্কুলের খাতাগুলি গোছা করে হাতে নিয়ে শ্রীমতী মিস বিশ্বাসের বাড়ি গেল। নিঃশব্দে মিস বিশ্বাসের হাতে এগিয়ে দিল টেলিগ্রামটি। মিস বিশ্বাস চকিতে সেটি পড়ে নিয়ে, শ্রীমতীর হাত ধরে টেনে তাকে পাশে বসালেন।

"আজকে ছ'টার ট্রেন ধরলে তুমি সেখানে ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাবে, শ্রীমতী। একা যেতে পারবে, না কাউকে সঙ্গে দেব? ছুটির জন্য ভেব না।"

শ্রীমতী ধীরে-ধীরে বলল সে একা যেতে পারবে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নেবে বরং।

"না, না, অত রাত্রে একা ট্যাক্সিতে যেও না। তার চাইতে বাস ভালো। সাবধানের মার নেই। কিসে কি হয় কে জানে।"

কত কথা মনে হল রেলগাড়ির কামরাতে বসে। পরের স্টেশনে একজন প্রৌঢ়া প্রবেশ করলেন। শ্রীমতীর সিঁথির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে

বললেন, "বিয়ে-টিয়ে করনি, খুব ভালো কাজ করেছ। কোথায় যাচ্ছ, মা?"

শ্রীমতী সংক্ষেপে উত্তর দেয় মায়ের অসুখ, স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে।

"ওমা, তুমি মাস্টারণী বুঝি? মায়ের সেবার কি অন্য লোক নেই, ভাইবোন নেই তোমার?"

শ্রীমতী মাথা নাড়ে।

প্রৌঢ়া কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিপাত করেন। "ওমা, সে কি কথা, বিয়েথাও করলে না, ভাইবোনও নেই, বাপও নেই, মাও চলল! তারপর তোমার অবস্থাটা কি হবে?"

শ্রীমতী নিরুত্তর থাকে। কে যেন তার কণ্ঠরোধ করে দেয়, টনটন করে ওঠে বুকটা। যে শ্রীমতী একলা এসেছিল, একলা যেতে প্রস্তুত, তার আবার মা মরে গেলে কি হয়? যে ছ'মাস আগেও জানত না মাকে, কি হয় তার মা না-থাকলে? শ্রীমতীর মায়ের মতো মা যার, মায়ের মৃত্যুতে তার আবার দুশ্চিন্তা কিসের? তবু থেকে-থেকে মন বলে, হায়-হায় তবে তুমি কাকে সুখী করবে?

রাত্রি ন'টার পর ট্রেন কলকাতায় পেঁছুল। চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছে। এই বৃষ্টিতে টালিগঞ্জ! ভাবে কে আবার আমাকে নিতে আসবে? আমাকে নিতে আসবার লোকের কি দরকার? দেখ দাদাবাবু আমাকে কেমন একা চলতে-ফিরতে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমি নিজেই পারি। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে পেঁছবার আগেই রমেশ চৌধুরীর ছোটকাকা এগিয়ে এসে শ্রীমতীর হাত থেকে তার ছোট সুটকেশটা টেনে নিলেন। এ কি হল শ্রীমতীর? দুই চক্ষু প্লাবিত করে অশ্রু নামল কেন? ছোটদাদামশাই ব্যস্তসমস্তভাবে আধময়লা একখানা নস্যির গন্ধমাখা রুমাল এগিয়ে দিলেন। অন্যদিন হলে কিছুতে নিতে পারত না। আজ দু'হাত বাড়িয়ে সেই রুমাল নিয়েই সে চোখ মুছল।

বাইরে একটানা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি চলছে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে পেঁছিতে-পেঁছিতে দুজনেই ভিজে গেল।

"ছোটদাদু, মা এখন কেমন আছেন?"

"চল দেখবে চল, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই দিদিমণি, কালই হয়তো দেখবে, কথা বলতে পারছে পদ্মা।"

"মা কি কথা বলতেও পারেন না, ছোটদাদু? কে আছে তাঁর কাছে? আয়া?"

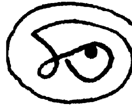
"হ্যাঁ, আয়া আছে, নার্সও আছে, আবার মতিরাণীও আছে। সেই তো আমাকে আর পরেশকে খবর দিল।"

মতিরাণী মায়ের কাছে আছেন। শ্রীমতীর চিত্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হল।

"তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না দিদিমণি, ডাক্তারবাবু বলেছেন পদ্মা এ-যাত্রা সামলিয়ে উঠবে খুব সম্ভব। তবে হয়তো চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে না। তোমাকে সত্যি-সত্যিই এবার মায়ের ভার নিতে হবে, শ্রীমতী। তার জন্য মনকে প্রস্তুত কর। এবার সবাইকে দেখিয়ে দাও রমেশ চৌধুরী তোমায় কি পদার্থ দিয়ে তৈরি করেছে।"

শ্রীমতী মুখ তুলে বললে, "আমি ভয় পাই না, ছোটদাদু।"

ছোটদাদামশায় সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখলেন।



টালিগঞ্জের সেই হলদে রঙের বাড়িখানির সামনে ট্যাক্সি যখন দাঁড়াল তখনো টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। উপরে পদ্মার ঘরে স্তিমিত আলো; আলোকিত শূন্য সিঁড়িটা অন্ধকারের দিকে উঠে গেছে। চুপচাপ চারদিক নিঃসাড়। সমস্ত বাড়িখানি যেন বর্ষারাত্রির কানে ফিসফিস করে বলছে, "শব্দ তুল না, এ-বাড়িতে একজনের বড় অসুখ।"

গাড়ির শব্দে সিঁড়ি দিয়ে মতিরাণী নেমে এলেন, শ্রীমতীকে আলিঙ্গন করে বললেন, "কোনো চিন্তা কোরো না, শ্রীমতী। ও এখন ঘুমোচ্ছে, নাইট-নার্স আছে পাশে। তুমি একবার দরজার কাছ থেকে দেখে নিচে এস, খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়। শরীরের অযত্ন কোরো না। নিজেকে নিজে না-দেখলে আর কে দেখবে? এস আমার সঙ্গে।"

ছোটদাদামশায় বসবার ঘরে চৌকির উপর বসে রইলেন। মতিরাণীর সঙ্গে কম্পিত পায়ে শ্রীমতী মায়ের রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সবুজ শেড লাগানো আলোর মুখ ফেরানো, একটুখানি সোনালী আভা পদ্মাসনার মুখে এসে পড়েছে। শ্রীমতী চেয়ে দেখল মায়ের মুখে সেই ক্লিষ্টভাব আর নেই, তার বদলে মুখময় একটি কোমল দুর্বল ভীরু নির্ভরশীলতা ছড়িয়ে পড়েছে। পদ্মাসনার সেই তীক্ষ্ম তেজ কোথায়? কে তাকে এমন শান্ত করে অসহায়ভাবে শুইয়ে রেখেছে এখানে! বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো পড়ে আছেন পদ্মাসনা; কপালের উপরে দু-একগুছি কোঁকড়া চুল। নিমীলিত দুই চোখে, চোখের কোলে সুদীর্ঘ

পল্লবের নীল ছায়া পড়েছে, ধনুকের মতো দুই ভুরু ঠিক যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এখনো তার মা কি সুন্দর! কি অপরূপ সুন্দর!

শ্রীমতী একবার ঢোঁক গিলে, মায়ের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। বার-বার মনে-মনে অঙ্গীকার করল, তোমাকে আমি কখনো ত্যাগ করব না। তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি তোমাকে সারিয়ে তুলব। মাগো, যতদিন আমি আছি তুমি একা থাকবে না।

চকিতে মতিরাণীর দিকে একবার ফিরে তাকালো শ্রীমতী। ছি, ছি, আমি নিজের কথা নিয়েই মশগুল। মতিরাণীও তো আছেন, অনাদৃত মতিরাণীও তো আগাগোড়া কাছে-কাছে রয়েছেন। আরো যেন সহাস পেল বুকে।

নিচের ঘরে সুনয়নী দেবীর সঙ্গে ছোটদাদু বসে কথা বলছেন। নিচে নামতেই তিনি ছুটে এলেন।

"তোমার মায়ের খবর নিতে এসেছিলাম, শ্রীমতী। এখন অনেকদিন তোমাকে মায়ের সেবা করতে হবে, শক্তি সঞ্চয় কর।" কাছে এসে আদর করে বললেন, "আমরাও আছি শ্রীমতী, মনে রেখ তুমি একলা নও, আমরা সবাই আছি, ভয় কোরো না।"

সুনয়নী দেবী বিদায় নিলেন, কিন্তু ছোটদাদামশায়কে মতিরাণী ছাড়লেন না, তাঁকে খেয়ে যেতে হল। মতিরাণী নিজেও আর বাড়ি গেলেন না, শ্রীমতীর ঘরেই রইলেন রাত্রিতে।

মতিরাণী ঘুমিয়ে পড়লেও বহুক্ষণ শ্রীমতীর ঘুম এল না চোখে। বিনিদ্র মস্তিষ্কে চিন্তার অবিরল মিছিল চলেছে। ভাবল, এই তো আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আজ। জমিদার-বাড়ির সেই বৌটি, মিসেস অধিকারী সবাই নিজের নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে, সে-ই বা পাবে না কেন? মা ভালো হয়ে যাবেন কিন্তু আর মাকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। আজ সত্যিই তাকে দিয়ে মায়ের বড় প্রয়োজন। না, আর তার মনে কোনো দ্বিধা নেই।

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। গভীর নিশীথে শুভেন্দুর চিন্তা এসে আর তার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। তার গোপন হৃদয়ে সেই মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের শেষ প্রতিধ্বনি একেবারে নীরব হয়ে যাক। রমেশ চৌধুরী কি পদার্থ দিয়ে শ্রীমতীকে তৈরি করেছিলেন এবার তার পরীক্ষা হোক।

জোর করে দুই চোখ বন্ধ করে প্রাণপণে সে সব-কিছু ভুলতে চাইল। ঘুম আসুক। ঘুম নেমে আসুক তার অপরিসীম শান্তি আর সান্ত্বনা নিয়ে। তবু তার বন্ধ চোখের অবাধ্য অশ্রু বালিশকে সিক্ত করল।

১৪

সংসারেরও যে রাষ্ট্রনৈতিক দিক আছে সেকথা এইবার বোঝা গেল। সকালে গোমেশ এসে জানিয়ে গেছে, একদিকে নার্স মেমসাহেবের হুকুম, আরেক দিকে মতিরাণীদিদির সর্দারি, মাঝখানে সে যায় কোথায়? আয়া এসে নালিশ করে গেছে, আজ পনেরো বছর ধরে সে মেমসাহেবের কাজ করে এসেছে, আর এতদিন বাদে কি তাকে কোথাকার এক নার্সের কথায় উঠতে বসতে হবে!

মতিরাণী সকালে উঠে চা না-খেয়েই বাড়ি চলে গেছেন, স্নানটান সেরে একটু বেলায় আসবেন, অগত্যা শ্রীমতীকেই সমস্যা ভঞ্জন করতে হয়। উপরন্তু কাল রাত্রের তরুণী বাঙালী নার্সটিও তার কপিল নয়ন থেকে বিদ্যুৎ হেনে জিগগেস করে বসল, এই সব উজবুক দিয়ে রোগিনীর কাজ কি করে চলতে পারে! একটু গরম জল চাইলেও যদি ঠিকমতো পাওয়া না-যায়, তবে—ইত্যাদি।

দেখতে-দেখতে বেলা আটটা বাজল।

দিনের নার্স এসে পেঁাছল ঠিক ঘড়ি ধরে। শ্রীমতী যেন হাতে চাঁদ পেল। প্রৌঢ়া, ফিরিঙ্গি মহিলা, মুখে প্রসন্নতার আভা। শ্রীমতীকে দেখে তাঁর হাসি ধরে না, সস্নেহে তাকে অভয় দিলেন, সঙ্গে করে উপরে নিয়ে গেলেন।

রাত্রের নার্সটি তৎক্ষণাৎ তার ছোট সুটকেশ হাতে নিয়ে উঠে বিদায়ের জন্য তৈরি হল। রাত্রি জাগরণে তার মুখখানি ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শ্রীমতীর

মায়া হল দেখে। কোমল স্বরে জিগগেজ করল, চা-টা কিছু দেবে কি না, সংক্ষেপে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল নার্সটি।

আজও পদ্মার কোনো পরিবর্তন হল না। ডাক্তারবাবু এলেন গেলেন, ওষুধ-পথ্য নির্দেশ করে দিলেন। নার্সের নাম মিসেস স্লেন, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে নিপুণ হাতে কাজে লেগে গেলেন তিনি। মতিরাণী ফিরে এসে গৃহস্থালীর ভার নিলেন। শ্রীমতী কি করবে? তার তো হাতে কোনো কাজ নেই! কেউ ডাকে না তাকে, সে যেন প্রায় প্রয়োজনের বাইরে! বার-বার অকারণে উপর-নিচ করে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কতবার ভাবল মতিরাণীকে বলে, মাসিমা, আর আপনি কষ্ট করবেন না, এবার আমার হাতে ছেড়ে দিন। কিন্তু বলি-বলি করেও বলা হল না, মতিরাণীর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বিপদের সময় সহায়তা দিতে পেরে তিনি অশেষ আনন্দ পাচ্ছেন! সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার তার নেই।

এর মধ্যে একসময় সে মিস বিশ্বাসকে ছোট একখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিঠি লিখে দিল, মায়ের অবস্থা জানিয়ে। ললিতাকে কিছু বলে আসা হয়নি, তাকেও লিখতে হল একটা পোস্টকার্ড। তারপর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চুপচাপ পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

আজও আকাশে মেঘের ঘটা, শ্রীমতীর মন উদাস হয়ে যায়। কোনো কি উদ্দেশ্য আছে, এই ঘন নীল মেঘ, পত্রপল্লবে এই শ্যাম সবুজের বিন্যাস, এই গাছতলায় জমে থাকা ফুলের সৌরভের? কোনো কি অর্থ আছে, সুন্দরী পদ্মার জীবনের? আছে কি? কোন কালে পদ্মার কালো বেঁটে স্বামী মরে গেছেন, তাঁর জীবনেরই বা কি অর্থ ছিল?

চমকে দেখে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন মিসেস স্লেন, "এস তো ডার্লিং আমার সঙ্গে। তোমার মা চোখ মেলেছেন, বোধকরি তোমাকেই খুঁজছেন।"

ত্রস্তপদে মায়ের ঘরে এসে দাঁড়াল শ্রীমতী। গভীর ব্যথাপূর্ণ চোখে

পদ্মা তাকালেন, একবার চেষ্টা করলেন কথা বলতে, স্বর ফুটল না, বড়-বড় দুই বিন্দু অশ্রু পদ্মার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দুই বাহু দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল শ্রীমতী, কানের কাছে মুখ নিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, "মাগো, কেন ভাবছ? এবার তুমি ভালো হয়ে যাবে। এই দেখ আমি কাজকর্ম ফেলে ছুটে এসেছি তোমার কাছে, তুমি কেমন ভালো না-হও দেখব।" বলতে বলতে চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল, "আর আমি তোমাকে ফেলে যাব না, মা। এখন থেকে তোমার কাছে থাকব, কেমন?"

মা নির্বাক, শ্রীমতীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আর চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

মিসেস স্লেন শ্রীমতীকে মৃদু হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শাদা রুমাল বের করে পদ্মার চোখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর জানলা খুলে দিতেই আলো এসে ঘর ভরে দিল। কখন মেঘ কেটে গিয়ে ম্লান একটু রোদ উঠেছে আকাশে।

মতিরাণী এসে সেই কখন থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, অনুমতি না-পেলে অহঙ্কারী পদ্মার ঘরে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছেন না। সেদিকে চোখ পড়তেই পদ্মার মুখ হঠাৎ কেমন একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। ব্যাকুল হয়ে উঠল শ্রীমতী।

মিসেস স্লেন বলছিলেন, "দেখ ডার্লিং, তোমার মা আজ কত ভালো আছেন। এ ক'দিন নিস্পন্দ অচেতনভাবে কেটেছে, সুখ দুঃখ কি রাগ কোনো কিছুরই বোধ ছিল না। তবে আমার মনে হয় ঐ যে লেডি, উনি এখানে না-এলেই রোগিনীর পক্ষে ভালো।"

মতিরাণী ইংরিজি জানেন না। কি বুঝতে কি বুঝলেন, কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে দু'পা এগিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে: "কি বলছে মেমসাহেব, আমি বাপু বুঝিটুঝি না। তবে পদ্মা যে এবার শিগগিরই সেরে উঠবে, সে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাই না পদ্মা, আর তুমি উঠে বসলেই আমারও

ছুটি।" পদ্মার ভুরু আরও কুঞ্চিত হল। বিব্রত শ্রীমতী মতিরাণীকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসে। "ওঃ! রোগীর ঘরে আমি যে যাই মেয়ের তাতে আপত্তি আছে বুঝি? তা, সেকথা স্পষ্ট করে বললেই হত।"
এতক্ষণে মতিরাণীর কাছে স্পষ্ট হল ব্যাপারটা। ছি, ছি, শ্রীমতী এর মধ্যে কি করবে? সসঙ্কোচে সে তাঁর অভিমান ভাঙতে চেষ্টা করল, "না, মাসিমা, সে কথা কেন। ঘরে কারো না-যাওয়াই নাকি ভালো, ডাক্তারবাবু বলছিলেন। মা কেমন যেন সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাই—"
এত সহজে কেউ কি ভুলাতে পারে? "তোমার মাসিমাকে একেবারে বোকা ভেবেছ নাকি, শ্রীমতী? আমি সবই বুঝি। কর্তব্য-কাজ যা বুঝি করতে চেষ্টা করি, তা সে যদি ওদের ভালো না লাগে, কাল থেকে আর আসব না।" মতিরাণীর মুখ লাল হয়ে ওঠে।
হাত ধরে অনেক করে শ্রীমতী তাঁকে বোঝাল, "মাসিমা, আমার কিন্তু আপনাকে খুব ভালো লাগে। আপনি না-এলে আমার কত যে কষ্ট হবে বলতে পারি না। কাজটাজ না হয় আমি করে নিলাম, কিন্তু আমার কাছে আপনার বন্ধুত্বেরও অনেক মূল্য যে।"
মতিরাণীর সরল মন তৎক্ষণাৎ গলে জল। "মানিক, মুখে বললেই কি আর আমি তোমাদের ছাড়তে পারি।"

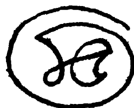
কত লোক পদ্মার খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। জানলে কত না খুশি হতেন পদ্মা! শ্রীমতী ভাবে, তবে আমি এদের ভুল বুঝেছিলাম? আমার মাকে এরা সত্যি তো ভালোবাসে! তবে এরা পদ্মার রূপ গুণ দেখেই মুগ্ধ। এত কষ্টের মধ্যেও পদ্মা শুভ্র গন্ধরাজ ফুলের মতো শয্যায় পড়ে আছেন। কিন্তু আর কি কখনো তিনি গান গাইবেন? অকারণে শ্রীমতী বার-বার মায়ের ঘরে ঘুরে যায়। ঘনপল্লবে ঘেরা দুটি মুদিত চক্ষুর

দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারে না। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে পদ্মার বক্ষের স্পন্দন। মিসেস স্লেন পাশে বসে পশমের জামা বুনছেন, কোমল নয়নে তাকিয়ে দেখেন তিনি।

কিন্তু মতিরাণী আর উপরে আসেন না। শ্রীমতী নিচে গিয়ে তাঁর কাছে দুদণ্ড সান্ত্বনা খোঁজে। "অনেক লোকের এরকম হয় আবার সেরেও যায়, না মাসিমা? মায়ের কি আর এমন বয়েস? আসছে বছর পঞ্চাশ পুরবে, সে কি আবার একটা বয়স নাকি? নিশ্চয় দেখতে-দেখতে উঠে বসবেন, না মাসিমা?"

কারো মন যুগিয়ে কথা বলা মতিরাণীর স্বভাবে নেই। বলেন, "কি জানি শ্রীমতী, আমার পিসিমার চল্লিশ বছর বয়সে ঐরকম হয়েছিল, ব্যস দু-সপ্তাহেই খতম! অনেকে আবার চার-পাঁচ বছর কি তারো বেশি বেঁচে যায়। ঐ একভাবে বিছানায় পড়ে থাকে। হয়তো একটু ভালো হয়, জড়িয়ে দু'একটা কথাও বলে, তবে উঠে বড় একটা বসে না।"

মতিরাণী পরিশ্রম করতে পারেন, মনের ব্যথা দূর করতে পারেন না!



আরও গেল কিছুদিন। সেদিন পরেশ নাগ এসে শ্রীমতীকে নিচে ডেকে পাঠালেন। খাবার ঘরের টেবিলের উপর কাগজপত্র ছড়ানো, পদ্মার সব ব্যাঙ্কের হিসাব একপাশে রয়েছে। পরেশ নাগ সস্নেহে শ্রীমতীকে বসতে বললেন। "দুজনে বসে একটু পরামর্শ না-করলে চলে না যে শ্রীমতী। তোমার মায়ের এই তো সব হিসাব। কত লক্ষ টাকা রোজগার করেছে পদ্মা, আশ্চর্য যে তার কিছুই রাখতে পারেনি। খেয়ে-দেয়ে বেড়িয়ে কাপড়-গয়না কিনে বিশেষ কিছু আর নেই। তুমি ছেলেমানুষ শ্রীমতী, এখন আমোদ করে বেড়াবার বয়েস, তোমাকে এসব কথা বলতে আমার কত যে খারাপ লাগছে। অথচ না বলেও উপায় নেই, তুমি ছাড়া আর পদ্মার আপন বলতে কে বা আছে! এই দেখ তিনটি ব্যাঙ্কের খাতা, সবই প্রায় তলায় ঠেকেছে এসে। অথচ এই অসুখে, নার্স ওষুধ ডাক্তারেই দিনে দুশোটাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।" শ্রীমতীর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে কোমল-কণ্ঠে বললেন, "অমন ভাবে তাকিও না, মা। আমরা এখনো বেঁচে আছি। পদ্মা একদিন আমার কোম্পানিকে লক্ষ-লক্ষ টাকা এনে দিয়েছে। তার অসুখে চিকিৎসার জন্য কোম্পানি থেকে আমরা সামান্য হাজার খানেক টাকা দিতে ইচ্ছে করি। ঋণশোধ এতে হবে না। হয়তো সমসাময়িকভাবে বিপদ কিছুটা কাটবে এইমাত্র। তারপর ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে। ডাক্তার বলেছেন এরকম কেস দীর্ঘকালের ব্যাপার। তোমাদের কি নিকট আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব

কেউ নেই এসময়ে যাঁদের কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে? তোমাকে আমি কাজ একটা দিতে পারি এক্ষুনি, কিন্তু গোড়াতে কতই বা পাবে তুমি! তার উপর সারাদিন বাড়ি না-থাকলে পদ্মার কাছেই বা কে বসবে? গোমেশ, আয়া, বাহাদুর ওরা হচ্ছে বাড়ির শৌখিন ব্যাপার, এসবেতে টাকা লাগে মেলা। বাড়িটা এদিকে বন্ধক দেওয়া, যদিও এখন কিছুদিন তারা কিছু বলবে না, আমাদের জানাশোনা লোক, মায়াদয়া কিছু আছে এখনো। আমার পরামর্শ শোনো, মা। এখুনি তোমার কোনো কাজে ঢোকা ঠিক হবে না, চাঁপাডাঙার কথাও তোমাকে ভুলে যেতে হবে। আমি বলি বাড়ির এই একতলাটা ভাড়া দিয়ে দাও, ঐসব শৌখিন চাকর-টাকর ছাড়াও, একটা ভালো বাঙালী চাকর রাখ, তাতেই চলে যাবে। এমন সাজানো বাড়ি, আমি পাঁচশো টাকাতে আমার এক বিশেষ বন্ধুকে ভাড়া দিয়ে দিতে পারি। এখুনি কিছু ব্যস্ততা নেই। অবসর মতো তুমি ভেবে দেখ। ঐ হাজার টাকা আর পদ্মার সামান্য যা ব্যাঙ্কে আছে, তা দিয়ে দিন দশ-পনেরো বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।"

কি বলবে শ্রীমতী ভেবে পেল না। কত আপনার লোক মনে হয় এই পরেশ নাগকে। বিদায় নেবার সময় বললেন, "আত্মীয়-বন্ধু কেউ থাকলে এখন একটু খবর দিলে ভালো হয়, শ্রীমতী। বিপদের দিনেই তো বন্ধুদের স্মরণ করতে হবে।"

পরেশবাবু চলে গেলেন। শ্রীমতী তার পরেও বহুক্ষণ সেইখানে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কে আছে তাদের? চোখ বুজলেই রমেশ চৌধুরীর মুখখানি মনে পড়ে। আর কেবা আছে! ভগবানের উপর এলামাসি বেলামাসিদের অগাধ বিশ্বাস। সুখের সময়ে অতটা মনে না-করলেও, বিপদে পড়লে বা দুঃখ-কষ্ট পেলে সর্বদা তাঁরা ভগবানকে স্মরণ করে থাকেন। বহুবার বলতে শুনেছে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। অথচ এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো সাড়া সে অনুভব করেনি। উপরন্তু রমেশ চৌধুরীর আরেকটি কথাও ভুলবার নয়।

"বিপদ হলেই ডাকবি কি রে? এতদিন তো কিছু না-বলতেই তোকে বেশ সুখে ও নিরাপদে রেখেছিলেন, এখন আবার তাঁকে তাঁর কর্তব্য শেখাবি নাকি?"

মতিরাণী এসে পাশে বসলেন। "অত কি ভাবছ, শ্রীমতী? আমি তোমার মাসি হই না? আমার বাড়িতে মেলা জায়গা, থাকবার লোক নেই। তোমরা কেন এই গোটা বাড়িটা দুটো ফ্ল্যাট করে ভাড়া দিয়ে আমার কাছে এসে থাক না?"

"তা কি কখনো হয় মাসিমা?"

"হবে না কেন? আমার উপরতলাটা তোমাদের ছেড়ে দেব আমি। মোটা মানুষ আজকাল অত উপর-নিচ ভালোও লাগে না। তোমাদের মতো তোমরা থাকবে, আমার মতো আমি। কেন হবে না? এ-বাড়িটা থেকেই তোমাদের তাহলে মাসে হাজার টাকা আয় হতে পারে। বেশ চলে যাবে দুজনের। আমাকে পর ভেব না তুমি, শ্রীমতী।" শুনে শ্রীমতীর চোখ জলে ভরে এল।

ছোটদাদামশাই ইতিমধ্যে এলামাসি বেলামাসিদের কাছে পদ্মার অসুখের কথা জানিয়ে এসেছেন, তাঁরা কেউ দেখতে আসেননি। মুখে সহানুভূতি পাঠিয়েছেন। এমন কি ছেলে-মেয়েরাও চিঠিপত্র লেখেনি কেউ। চোখ ফেরাতেই মতিরাণীর কাজল-মাখা সস্নেহ দুটি চোখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। এত অবজ্ঞা সয়েও পদ্মার উপকার করতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছেন! খয়েরের দাগ লাগা পরিপুষ্ট হাত দিয়ে শ্রীমতীর হাত ধরে বললেন, "তোমরা ছাড়া আমার কেউ নেই, শ্রীমতী। কোন কালে, কত দুঃখে সবাইকে ছেড়েছুড়ে এসেছি। আমার বাড়িঘর টাকা-পয়সা সব আজ হয়েছে, কিন্তু কে ভোগ করবে? আপনার মানুষ কেউ নেই। তুমি ভাবছ আমি তোমাদের দয়া করছি? তা নয়, শ্রীমতী, আমার শূন্য ঘরগুলো সব খাঁ-খাঁ করে, দয়া করে তোমরা এস!" দুই হাতে চোখ ঢেকে মতিরাণী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

বাহাদুর একখানা চিঠি দিয়ে গেল, মিনিদি লিখেছে: "বেলাপিসির কাছে শুনলাম তোমার মায়ের অসুখের কথা। একটি ভালো নার্সের ব্যবস্থা করে পত্রপাঠ চলে এস। টাকার জন্য কি ভাবনা? মায়ের ব্যাঙ্কের খাতা এখন আমার হয়েছে, কত দরকার অসঙ্কোচে আমাকে জানাবে। রুগীটুগী একটা বিষম নুইস্যানস শ্রীমতী, ওসব নিয়ে জড়িয়ে পড়তে নেই।"

কিন্তু রমেশ চৌধুরী শ্রীমতীকে শিখিয়েছিলেন—সুস্থ শরীর থাকতে কারো কাছে এ-জীবনে হাত পাতিস না শ্রীমতী। আর স্বাস্থ্য যদি ভেঙে যায় তাহলে একটু বুদ্ধি করে মরে যাস। তাহলে আর হাত পাতবার কথাই উঠবে না।

অসুখের কথাটা পুতুলের কানেও গিয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ির সরকার-মশায় একখানি চিঠি নিয়ে এলেন। পুতুলও লিখেছে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে শ্রীমতীদি যেন চলে আসে। এ-বিপদে যেন তাদের সহানুভূতি জানে, আর যদি কিছু দরকার হয় তবে যেন পুতুলের স্বামীকে একটু জানায়।

বিকেলে ললিতা আর মিস্টার বোস এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীমতীর বুকখানি আনন্দে ভরপুর হল। মিস্টার বোস বার-বার বললেন, "শ্রীমতী দেবী, আমরা থাকতে নিজেকে একলা মনে করবেন না। মা একটু ভালো হলেই, ওঁকে চাঁপাডাঙায় নিয়ে আসুন। পাঁচজনে মিলে ওঁকে সুস্থ করে তোলা যাবে।"

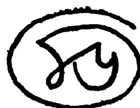
শ্রীমতী শুনে ম্লান একটু হাসল, "মা না-সারলেও আপনাদের দেখে নিজের মনের অসুখগুলো সব সেরে গেল, মিস্টার বোস।"

ললিতা বেশি কিছু বললে না, শুধু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে রইল। ললিতা আজকাল কি সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলা চা-খেয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন, রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যেতে হবে। কাজের চাপ রয়েছে।

রাত্রের নার্স তার বিমর্ষ মুখ আর ছোট সুটকেশটি নিয়ে যখন উপস্থিত হল, তখন আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। মিসেস স্লেনের জন্য শ্রীমতী রিক্সা আনিয়ে দিল। মেঘাচ্ছন্ন নৈশ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলে ললিতারা আজ আমার জন্য কত না ভিজবে। উপরে গিয়ে দেখে এল রাত্রের নার্সের কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। এই প্রাণীটি নিজের চারধারে সর্বদা একখানি অদৃশ্য অন্তরাল রচনা করে রাখে, সেটা ভেদ করে কারো প্রবেশাধিকার যেন নেই। কতোবার চেষ্টা করেছে শ্রীমতী, উপযাচিকা হয়ে ভাব করতে গেছে, ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছে প্রতিবার। আশ্চর্য মেয়ে!

পা টিপে-টিপে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখল ঘুমিয়ে আছে পদ্মা। তাঁর ক্লান্ত মুখ থেকে বয়সের ভার শুষ্ক ফুলের মতো হালকা হয়ে ঝরে পড়েছে। আবার যেন পদ্মা ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছেন। নিদ্রিতা মায়ের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতীর মনে হল মা-মেয়ের আসন বিনিময় হয়েছে। সে আজ তার মায়েরও মা।



রাত কম হয়নি। নীরবে নিচে এসে দেখে রান্নাঘরের বারান্দায় কুরুক্ষেত্রের আয়োজন চলেছে। ক্ষুব্ধ মতিরাণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রুদ্ধ গোমেশ। শ্রীমতী যেতেই দুই পক্ষই তার কাছে কেঁদে পড়ল। পুনরায় শান্তি স্থাপন করতে কম বেগ পেতে হল না তাকে। রাগ করে মতিরাণী না-খেয়েই বাড়ি চলে গেলেন। গোমেশ উদ্ধতভাবে জানালে, এ-বাড়ির কে কর্ত্রী তারই যখন স্থির নেই, এ-ক্ষেত্রে একটা ভালো ব্যবস্থা না-হলে সে একমাসের নোটিশ দিতে বাধ্য হবে। পাড়া-প্রতিবেশী বহু লোকে তাকে বেশি মাইনেতে চলে যেতে সাধ্যসাধনা করে।

গোমেশের আরও কিছু হয়তো বলবার ছিল, হেনকালে শ্রীমতীর পাশে নিঃশব্দে এসে যে-মানুষটি দাঁড়াল, তার সুগম্ভীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই অপরাধীর মতো গোমেশ সুড়-সুড় করে রান্নাঘরে গা-ঢাকা দিল।

শুভেন্দু! শ্রীমতীর মুখে কথা ফুটল না। নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়াল দু'জনে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কারো চোখে পলক পড়ে না।

"তোমার দুশ্চিন্তার অংশ আমাকে দেবে, শ্রীমতী? আমার এত কালের একাকীত্ব দূর করে দেবে?" শুভেন্দুর গলায় আবেগের কম্পন! যেন আশা করা যায় না।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীমতী, তারপর কাঁপা গলায় ধীরে-ধীরে বলল, "মিনিদি?"

মিনিদি? শ্রীমতী, তুমি কি পাগল হলে? আমার বন্ধু, আমার মনের কথা সে জানে। এতদিন ধরে আমার জীবন তোমার প্রতীক্ষাতেই ছিল। অনেক সময় মনে হত দুরাশা। স্বপ্ন আমার ফলবে না। সেরকম মানুষ হয় না পৃথিবীতে, ফুলের মতো যে কোমল অথচ বিদ্যুতের মতো যার শক্তি। তারপর তোমার সঙ্গে যেই পরিচয় হল তখুনি আমি চিনতে পেরেছি। আমার মন বারবার বলেছে—সে মেয়ে তুমি। আমার অনেক ত্রুটি আছে, কতবার ক্ষমা করতে হবে আমাকে। ভুল করব, অন্যায়ও হয়তো করব, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কে বুঝবে আমাকে শ্রীমতী?"

এতক্ষণে শ্রীমতীর কণ্ঠে ভাষা ফিরে এল। বললে, "তোমার মুখে এ-কথা শুনে আমার জীবন সার্থক হয়েছে। তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু ভেবে দেখেছ সব কথা? জানো, আমার মা হয়তো চিররুগ্না থাকবেন, হয়তো দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকতে হবে তাঁকে। তাঁর অর্থ সম্পদ কিছু নেই, আপনার জন বলতে এক আমি। আমার সঙ্গে এই দায়িত্বের অংশ নিতে পারবে তুমি? সে যে বিষম বোঝা হয়ে উঠবে।"

শুভেন্দু তার চোখ থেকে চোখ সরাল না, "জানো না তুমি, না-ভেবে কখনো আমি কিছু করি না? তোমার মায়ের কথা আমি ভেবেছি। তোমাকে যে-ভার বহন করতে হবে সে-ভার আমারও। সে-অধিকার যদি আমাকে দাও আমি সুখী হব। আর কিসের ভয় শ্রীমতী? আমি ছাড়া কে আছে তোমার, বল তো? আমার অত বড় বাড়িতে কি তোমার মায়ের স্থান হবে না? আমার মা বেঁচে নেই, তোমার মা আমারও মা। দুজনের মিলিত সুখে তাঁকে আমরা সুখী করব। পারব না?"

শ্রীমতীর দুই চক্ষু প্লাবিত করে কখন অশ্রুর বন্যা নামল। স্বর্গ আছে কিনা কে জানে? কে জানে, ভগবানের অস্তিত্ব আছে কি নেই? জীবনে তবু মাঝে-মাঝে অবাঙমানসগোচর কোন সুখের স্বর্গলোক থেকে পরিপূর্ণ একটি ফুলের মতো খসে পড়ে নিটোল এক-একটি মুহূর্ত। ইচ্ছে করে তাকে চিরকাল বুকে করে রাখি, কিন্তু হায়, পৃথিবীর হাত

দিয়ে তাকে ধরা যায় না। অপরূপ এই মুহূর্তটিতে শ্রীমতীর হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কারা যেন তার নম্রশিরে আজ তাঁদের আশীর্বাদের অদৃশ্য হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন।
দেহে মনে রোমাঞ্চিত হওয়ার এই সুখ সে তো কখনো জানত না। এ-মুহূর্তটি আর কখনো ফিরে আসবে না জীবনে, কিন্তু যা বলা হয়ে গেল, শোনা হয়ে গেল, কোনোদিনও কি ম্লান হবে তার মাধুর্য? স্থূল পৃথিবীর দুঃখ আর তার কি করতে পারে?

শ্রীমতী শুভেন্দুকে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। রাত্রের নার্স অন্ধকারে সরে গেল একপাশে।
স্নিগ্ধগলায় শ্রীমতী ডাকল, "মা।" নিস্তব্ধ কক্ষের কোনায়-কোনায় মৃদু গুঞ্জরণ হল মা, মা, মা। শুভেন্দু এমন মধুর ডাক আর শোনেনি।
চকিত হয়ে উঠলেন পদ্মা, মস্তিষ্কের জড়তা একটু কাটল বুঝি; হৃদয়ের তুষার বুঝি গলল। জড়িত কণ্ঠে বললেন, "কি, মা।"
শুভেন্দু এগিয়ে এসে এই ছোট সংসারটির হাল ধারণ করল। "আজ থেকে আমাকে আপনার পুত্র বলে মনে করবেন।"
নিস্ফল প্রয়াসে দুর্বল দক্ষিণহস্ত শুভেন্দুর দিকে প্রসারিত করতে প্রবল চেষ্টা করলেন পদ্মা, বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল শুভেন্দু ও শ্রীমতী। পদ্মার মুখে কোমল একটি প্রসন্নতা আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ল।

নিচে এসে শুভেন্দু নিতান্ত বেরসিকভাবে বললে, "ঐ গোমেশটি স্বয়ং দ্রৌপদী হলেও, ওকে আমাদের মিস্টার খানের বাড়ি উপঢৌকন স্বরূপ পাঠানো যাক। আমার রাজেন ওকে দেখলেই ভিরমি যাবে।"

রাত বাড়ে দুজনের কথা আর ফুরোয় না। মিনিদির কথাও উঠল। বাড়িঘর বিক্রি করে সে বিলেতে বসবাস করবার সংকল্প করেছে। আহা মিনিদি! মন চায় সবাই সুখী হোক।

দরজায় মৃদু শব্দ উঠল। অনুতপ্ত মতিরাণী ফিরে এসেছেন। সুচতুরা তিনি, দেখেই বুঝলেন। নীরবে সরে যাচ্ছিলেন, শ্রীমতী তাঁকে ডেকে ফেরাল, "মাসিমা, চলে যাবেন না, আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

মতিরাণী তখন হেসে-কেঁদে আকুল হয়ে গেলেন। ভুল করে শ্রীমতীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর শুভেন্দুর মুখচুম্বন করলেন।

পরদিন বাড়িতে উৎসবের হাওয়া বইতে লাগল। সবাই খবর পেয়ে আসছেন দলে-দলে। সবাই খুশি। বিকেলের দিকে এসে পেঁছিলেন এলামাসি, বেলামাসি, তাঁদের স্বামীরা, অতুল, লকেট্, বকেট্ ও সর্বশেষে মিস বিশ্বাস।

ছোটদাদামশায় অসংলগ্নভাবে অসংযত ভাষায় আপ্যায়ন করে বেড়াচ্ছেন অতিথিদের। আড়াল বুঝে শ্রীমতী একবার মিস বিশ্বাসের কানে-কানে জানাল, "আমি এ-বছরের শেষ পর্যন্ত থাকব কিন্তু।"

মতিরাণী কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। এখন এসে দরজার পর্দা সরিয়ে উপস্থিত অভ্যাগতদের নিবেদন করলেন যে তিনি অতিথিদের মিষ্টিমুখের আয়োজন করেছেন। তখন অতুল ও বকেট্ ঘাড় তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবার তাদের পালা।